দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

খেলার মাঠে আইডেন্টিটি ধ্বংসের স্লোগান
— পৃঃ ২৪

অসমকে ইনার লাইন পারমিটের আওতার বাইরে রাখা মোদী সরকারের মহতী পদক্ষেপ
— পৃঃ ১১

৭২ বর্ষ, ২২ সংখ্যা।। ৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।। ১৯ মাঘ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

BELLA VISTA
51 Limited Edition Flats
Flat Starts From ₹87 Lac Onwards
Birds Eye View
Roof Top Garden
Swimming Pool
Podium
WBHIRA Registration Number : HIRA/P/KOL/2019/000483
www.edengroup.in
Developed by: EDEN
JALAN
9830 116 116

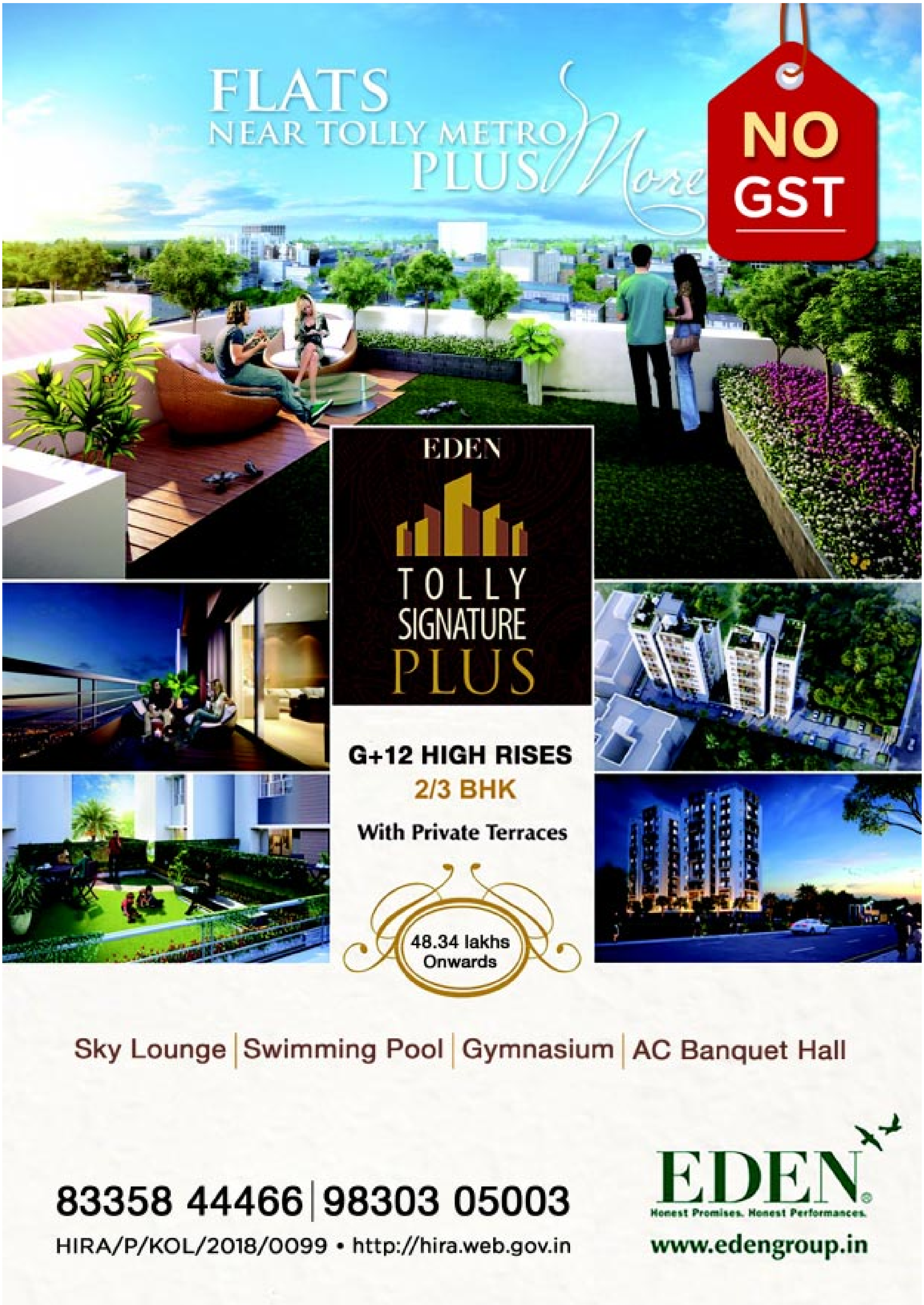
FLATS
NEAR TOLLY METRO
PLUS More
NO
GST
EDEN
TOLLY
SIGNATURE
PLUS
G+12 HIGH RISES
2/3 BHK
With Private Terraces
48.34 lakhs
Onwards
Sky Lounge | Swimming Pool | Gymnasium | AC Banquet Hall
83358 44466 | 98303 05003
HIRA/P/KOL/2018/0099 • http://hira.web.gov.in
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
www.edengroup.in

www.edengroup.in
EDEN RICHMOND PARK
READY TO MOVE
NO GST
EDEN
Honest Promises. Honest Performances.
24.50 L Onwards
•2/3 BHK•
Near Narendrapur
(Atlas More, Kodalia)
NEW LAUNCH
EDEN RICHMOND ENCLAVE
14.47 L Onwards
•1/2/3 BHK•
Landscape Garden | AC Community Hall | Swimming Pool | Gymnasium & Spa | Home Theater Room | Children's Play Room | Games Room
Eden Richmond Park: HIRA/P/SOU/2019/000603 • http://hira.web.gov.in
Eden Richmond Enclave: HIRA/P/SOU/2018/000240 • http://hira.web.gov.in
9073666771

www.edengroup.in
EDEN
HURRY!!
Limited Period Offer
7Lacs
Onwards
1 RK
1/2 BHK
Meghbalika
Only 1% GST
Between Rajpur & Baruipur, Khasmullick
Adda Zone
Swimming Pool
Landscape Garden
HIRA/P/SOU/2018/000209
https://hira.wb.gov.in/
AC Banquet Hall I AC Gymnasium I Outdoor Kid's Play Area
Toddlers Play Area I Guest Room I Senior Citizen Zone I Rock Climbing I Home Theater
Card Room I Art Walk with Bengal Art & Sculpture
98306 26262

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২২ সংখ্যা, ১৯ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৩ ফেব্রুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৯

অসমকে ইনার লাইন পারমিটের আওতার বাইরে রাখা মোদী সরকারের এক মহতী পদক্ষেপ □ উর্মীশ্রী দেব □ ১১

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ বাহিনীর তীব্র অভিঘাতেই ইংরেজরা ভারত ছেড়েছিল □ প্রণব দত্ত মজুমদার □ ১৩

এখন কাশ্মীরে স্থানীয় সংখ্যালঘু সমাজের কর্তব্য □ বিজয় আঢ্য □ ১৫

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রহসনে পরিণত করেছে মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি □ ডা: বলরাম পাল □ ১৮

যুগদ্রষ্টা দুই মহাপুরুষ— স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও ডা: হেডগেওয়ার □ অদ্বৈত দত্ত □ ২৩

খেলার মাঠে আইডেন্টিটি ধ্বংসের স্লোগান □ দেবাশিস লাহা □ ২৪

শতবর্ষের ইস্টবেঙ্গলে রাজনীতির কালিমা □ সঞ্জয় সোম □ ২৬

গোলাভরা ধান কাদের জন্য ফেলে এলেন কমরেড? □ দেবতনু ভট্টাচার্য □ ২৮

বিশ্বজোড়া ছিল বাঙ্গলার মসলিনের বাজার □ চূড়ামণি হাটি □ ৩১

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ রাজা দশরথের □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ৩৩

গল্প : দহনভার □ প্রেমাংশু বশিষ্ঠ □ ৩৫

সুনীতি কুমারের ভাবনায় বাঙ্গালি মুসলমান □ গৌতম কুমার মণ্ডল □ ৩৮

খোলা চিঠি : দিদির পাশে নাই রে... □ সুন্দর মৌলিক □ ৪৩

সামরিক শক্তির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভারতের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ □ স্বামীনাথন আইয়ার □ ৪৪

রাজ্যে শিক্ষা পরিবেশের দফারফা □ শুভ্র সান্যাল □ ৪৬

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ইসলামিকরণ □ ৪৭

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ □ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** □ **অঙ্গনা : ২১** □
সুস্বাস্থ্য: ২২ □ **খেলা : ৩০** □ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** □
চিত্রকথা : ৪২ □ **সমাবেশ-সমাচার : ৪৮-৫০**

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে
১০ ফেব্রুয়ারি
২০২০

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শাহিনবাগে ঘুস

প্রকাশিত হবে
১০ ফেব্রুয়ারি
২০২০

কয়েকটি সংবাদমাধ্যম দিল্লির শাহিনবাগ-সহ দেশের কিছু জায়গায় ছাত্র এবং একটি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বিক্ষোভকে সারা ভারতের সিএএ-বিরোধী প্রতিবাদ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। বিজেপির অনেকদিনের অভিযোগ, এই প্রতিবাদের পিছনে রয়েছে বিদেশি শক্তির মদত। সম্প্রতি ইডি-র প্রকাশিত একটি চিঠিতেও সেই ইঙ্গিত মিলেছে। জানা গেছে, নিষিদ্ধ সংগঠন সিমি-র রাজনৈতিক মুখ পি এফ আই এই প্রতিবাদ আন্দোলন পরিচালনা করতে এখনও পর্যন্ত ১২০ কোটি টাকা খরচ করেছে এবং এই টাকা এসেছে বিদেশ থেকে। শুধু তাই নয়, সিএএ এবং মোদী সরকারের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষকে উস্‌কে দেওয়ার দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে পি এফ আইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কংগ্রেসও। পি এফ আইয়ের পক্ষ থেকে কংগ্রেস নেতা কপিল সিবালকে ৭০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ইডি। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— শাহিনবাগে ঘুস। লিখবেন রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সুজিত রায়, দীপ্তাস্য যশ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

কাহার রক্ত কে ঝরাইয়াছিল?

সম্প্রতি ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ফুটবল ম্যাচে কলিকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে একটি ফেস্টুন দৃশ্যমান হইয়াছে। যাঁহারা এই ফেস্টুনটি লইয়া ওইদিন ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি হইয়াছে ফেস্টুনটিতে। কী তাঁহাদের বক্তব্য? ফেস্টুনটিতে যাহা লিখা রহিয়াছে তাহার অর্থ এই—রক্তের বিনিময়ে জমি পাইয়াছি, কাগজের বিনিময়ে নয়। পূর্ববঙ্গ হইতে যে হিন্দু শরণার্থীরা দেশভাগের আগে ও পরে এই দেশে আসিয়াছে এবং এখনও আসিতেছে—তাহাদের শরীর ও হৃদয় হইতে অজস্র রক্তক্ষরণ হইয়াছে এই কথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। এখন প্রশ্ন হইল, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম জড়াইয়া কাগজ দেখাইব না—এই কথা যখন উঠে, তখন এই প্রশ্নও উঠা প্রয়োজন যে, কাহার রক্ত ঝরিল এবং কে রক্ত ঝরাইল? যাহারা এইরূপ ফেস্টুন লইয়া ওইদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে দাপাদাপি করিয়াছে, তাহারা ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়কেই বিস্মৃত হইয়াছে। তদুপরি, এই অধ্যায়টিকে একটি বিকৃত ব্যাখ্যাও করিতেছে তাহারা। দেশভাগ পর্বের ইতিহাস যদি আমরা অধ্যয়ন করি, তবে দেখিতে পাইব, ওই সময় বাঙ্গালি হিন্দুর যে পরিমাণ রক্ত ঝরিয়াছে-–তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব অল্পই রহিয়াছে। ১৯৪৬-এর আগস্টে মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে হিন্দু নিধন বিশ্বের ইতিহাসে কলঙ্কতম ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। মাত্র তিনদিনের ভিতর ৫০০০ হিন্দু পুরুষ ও রমণী ওই সময় কলিকাতায় মুসলিম লিগ সমর্থকদের হাতে নিহত হইয়াছেন। বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা ছিল ১০ হাজারের কাছাকাছি। বহু হিন্দু নারী ধর্ষিতা হইয়াছিলেন। হিন্দুদের বাড়িঘরে অবাধে লুঠতরাজ চালানো হইয়াছিল। ওই বছরই অক্টোবরে নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর চরম আঘাত নামিয়া আসিয়াছিল। ৩০০০ হিন্দু পুরুষ এবং রমণীকে হত্যা করা হইয়াছিল। বহু হিন্দু নারীকে অপহরণ করা হইয়াছিল। ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল বহু হিন্দু পরিবারকে। দেশের স্বাধীনতা আসিয়াছিল বাঙ্গালি হিন্দুর রক্তে স্নাত হইয়া। ইহার পরেও তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে এবং বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারে কোনো বিরতি হয় নাই। পঞ্চাশের দশক এবং ষাটের দশকে পরপর দুই দইবার পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর চরম আঘাত হানা হইয়াছে। সাতের দশকে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময়ও পাকিস্তানি খান সেনাদের মূল লক্ষ্যই ছিল হিন্দু বাঙ্গালি। তাহার পর স্বাধীন বাংলাদেশেও হিন্দুরাই অত্যাচারিত হইয়াছে। অদ্যাবধি হইতেছে। সরকারি হিসাবেই বাংলাদেশ হইতে নির্যাতিত, অত্যাচারিত হইয়া হিন্দুদের এদেশে গড় আগমনের সংখ্যা বৎসরে পাঁচ শতাধিক। যাহারা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কাগজ দেখাইব না বলিয়া দাপাদাপি করিতেছেন, তাহাদের এইটুকু বোধের উন্মেষ ঘটা উচিত যে, এই হতভাগ্য অত্যাচারিত মানুষগুলিকে এই দেশে নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের উদ্দেশ্য। এই আইনের বিরোধিতা করার অর্থ যাহাদের রক্ত ঝরিয়াছে, সেই হিন্দু শরণার্থীর বিরোধিতা করা।

অবশ্য ঝুলি হইতে বিড়ালটি বাহির হইয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ যাহারা ওইদিন ওই ফেস্টুনটি লইয়া যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে উপস্থিত হইয়াছিল—তাহাদের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোনোরূপ সম্পর্কই নাই। নিজেদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে তাহারা ওইদিন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামটিকে ব্যবহার করিয়াছিল। সংবাদে আরও প্রকাশ, যাহারা এই কাণ্ড ঘটাইয়াছিল, তাহারা উগ্র বামপন্থীদের একটি গোষ্ঠী—যাহাদের ভাই-বেরাদরেরা জামিয়া মিলিয়া এবং জামা মসজিদ হইতে জিন্নাওয়ালি আজাদি'র দাবি তুলিয়াছে। ভারত হইতে অসম-সহ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবার হুমকি দিয়াছে। বাঙ্গালি হিন্দু শরণার্থীকে নাগরিকত্ব দেওয়ায় ইহাদের এত ক্ষোভ কেন তা সহজেই অনুমেয়।

সুভাষিতম্

সংরোহতি অগ্নিনা দগ্ধং বনং পরশুনা হতম্।

বাচা দুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্ ক্ষতম্।।

আগুনে পুড়ে যাওয়া বা কুঠার দিয়ে কেটে দেওয়া বন পুনরায় তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু কর্কশ ও খারাপ কথায় যে ক্ষত তৈরি হয় তা কোনোদিন পূরণ হয় না।

রম্যরচনা

নাগিনী

সারা রাত স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া করে শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে উঠে স্বামী এক কাপ গরম দুধ নিয়ে বিছানার কাছে এসে স্ত্রীকে ডাকতে লাগল। স্ত্রী জেগে গিয়ে বলল, কী ব্যাপার! রাতে ঝগড়ার জন্য নিজেকে অপরাধী ভাবছ তো, তাই দুধ নিয়ে সাধাসাধি করছ?

স্বামী বলল, আরে না, না, পাগল হয়েছে নাকি? আজ নাগপঞ্চমী। আজ সাপকে দুধ খাওয়াতে হয়। ভাবলাম ঘরেই যখন নাগিনী আছে, বাইরে খুঁজতে যাব কেন? নাও নাগিনী দুধ খাও!

গগনযান হবে একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ঐতিহাসিক সাফল্য : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নতুন বছর ও নতুন দশকের তাঁর প্রথম 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে গগনযান প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ২০২২ সালে ভারত যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর উদ্‌যাপন করবে, তখন দেশ 'ভারতবাসী হিসাবে গগনযান প্রকল্পের মাধ্যমে মহাকাশে যাওয়ার শপথ পূর্ণ করবে। তিনি বলেন, 'একুশ শতকে ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গগনযান প্রকল্প হবে একটি ঐতিহাসিক সাফল্য। নতুন ভারতের কাছে এটি দিক-নির্দেশিকা উদাহরণ হবে''। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় বিমানবাহিনীর চার বিমানচালকের প্রশংসা করেন, যাঁরা এই প্রকল্পে নভচর হিসাবে নির্বাচিত হয়েছেন। এরা রাশিয়ায় প্রশিক্ষণ নিতে যাবেন। ''এই সম্ভাবনাময় তরুণরা ভারতের দক্ষতা, মেধা, ক্ষমতা, সাহস ও স্বপ্ন পূরণের প্রতীক। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই রাশিয়ায় আমাদের এই চার বন্ধু প্রশিক্ষণ নিতে যাবেন। এর ফলে, ভারত-রাশিয়ার সৌহার্দ্যপূর্ণ ও সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, এক বছরেরও বেশি সময় ধরে তাঁদের প্রশিক্ষণের শেষে মহাকাশের বিষয়ে ভারতীয়দের যে আশা-আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তাঁরা তা পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

তিনি বলেন, ''সাধারণতন্ত্র দিবসের এই পবিত্র অনুষ্ঠানে আমি এই চার তরুণকে, এই প্রকল্পে যুক্ত ভারতীয় এবং রুশ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের অভিনন্দন জানাচ্ছি''।

উবাচ

রাহুল সিনহা
বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক

"আমরা আগেই বলেছিলাম সিএএ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-আন্দোলনে বিদেশ থেকে টাকা আসছে। আমাদের অভিযোগ যে অমূলক নয় ইডি তা প্রমাণ করে দিয়েছে। ক্ষমতার জন্য অশুভ শক্তির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে কংগ্রেস।"

মাওবাদী সংগঠনের কাছ থেকে কপিল সিবালের টাকা নেওয়া প্রসঙ্গে

দিলীপ ঘোষ
বিজেপির রাজ্য সভাপতি

"পশ্চিমবঙ্গে ৭০ লক্ষ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভোটার রয়েছে। যার মধ্যে ৫০ লক্ষের ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের ২২ জন সাংসদ হয়েছেন।"

পশ্চিমবঙ্গে নাগরিক পঞ্জীকরণ প্রসঙ্গে

মুকুল রায়
বিজেপি নেতা

"সংবিধান পরিষ্কারভাবে নাগরিকত্ব বিষয়ে কেন্দ্রকে সিদ্ধান্ত নেবার যাবতীয় অধিকার দিয়েছে। সুতরাং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী বললেন, বিধানসভায় কী প্রস্তাব পাশ করলেন, তাতে বদলে যাবে না সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন।"

বিধানসভায় সিএএ-বিরোধী প্রস্তাব পাশ হওয়া প্রসঙ্গে

সায়ন্তন বসু
বিজেপির সাধারণ সম্পাদক

"কিছু পত্রিকাগোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক দল রাজ্যটাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে চায়। এমনকী, বাংলাদেশের টাকায় দলও চালায়।"

হাওড়ায় ভারতমাতা পুজোয় পুলিশের বাধা প্রসঙ্গে

অসমকে ইনার লাইন পারমিটের আওতার বাইরে রাখা মোদী সরকারের এক মহতী পদক্ষেপ

উর্মীশ্রী দেব

এনআরসি, নাগরিকত্ব, এনপিআর প্রভৃতি ইস্যুতে বিজেপি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিবাদ আন্দোলনে এখন উত্তাল অসম-সহ সমগ্র দেশ। অসমবাসী প্রতিবাদের নামে নজিরবিহীন তাণ্ডবের সাক্ষী থেকেছে। 'আহ ওই আহ্, ওলাই আহ' (আয়, আয় বেরিয়ে আয়)। ছাত্র-ছাত্রী, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার মুখে একই স্লোগান, একই বাক্য। হাতে হাতে প্ল্যাকার্ড। দফায় দফায় অবরোধ-বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সমগ্র অসম। ভাঙচুর, আগুন অর্থাৎ প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব চালানো হলো সমগ্র অসমে। সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করা হয়েছে। একাংশ সুযোগসন্ধানী বৈদ্যুতিক মিডিয়াও এই ক্ষেত্রে ইন্ধন দিয়েছে। এই হিংসা প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ২০১৯ সালের সংশোধনী। আর এই উত্তাল পরিবেশের মধ্যেই দাবি উঠছে অসমকেও ইনার লাইন পরিমিটের আওতায় আনার জন্য। আসু, অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ-সহ কয়েকটি জাতীয়তাবাদী সংগঠন অনেকদিন থেকে দাবি করছে অসমে ইনার লাইন পারমিট চালু করার জন্য। আর এই নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন মতে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ২ নম্বর ধারার ১ নম্বর উপধারার শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে এইরূপ—

"Provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, or Christian community from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who entered into India on or before 31st December, 2014 and who has been exempted by the Central Government by or under clause (c) of sub-section (2) of section 3 of the Passport (Entry into India) Act, 1920 or from the application of the provisions of the Foreigners Act, 1946 or any rule or order made thereunder, shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this Act"।

এই নতুন সংযোজনের পিছনে কিন্তু মূল ভিত্তি হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের জারি করা পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের অধীনে দুটি 'নোটিফিকেশন' অর্থাৎ 'ঘোষণাপত্র' যা অফিসিয়েল গ্যাজেট বা রাজপত্রে প্রকাশ পায় ২০১৫ সালের ৮ সেপ্টম্বর। সরকারি নির্দেশ নম্বর হচ্ছে— G.S.T. 685 (E) under Passport (Entry into India) Act, 1920 (34 of 1920) এবং G.S.T. 686 (E) under Foreigners Act, 1946 (31 of 1946) এবং নোটিফিকেশন অনুসারে ওইদিন থেকেই তা সমগ্র দেশে কার্যকর রয়েছে। এই নোটিফিকেশনের মোদ্দাকথা হচ্ছে— '৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসি এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতারিত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইন প্রযোজ্য হবে না। মানবিক কারণেই তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই।' পরে ২০১৬ সালে অন্য আরেকটি নোটিফিকেশন জারি করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। নতুন নাগরিকত্ব আইন সংশোধনী অনুসারে ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসি এবং শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সালের পূর্বে ভারতের প্রবেশ করেছেন তাদেরকে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' বলা হবে না।

> **কেন্দ্রের ওই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিধি তৈরি করে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান করতে কেন্দ্রের কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আমলে ইনার লাইন পারমিট প্রথা চালু থাকা রাজ্যগুলি অনেকটা আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েবে। অন্যদিকে অসম ও ত্রিপুরা ইনার লাইন পারমিট প্রথার প্রচলন না থাকায় উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেতে যেমন সুবিধা পাবেন, তেমনি সেখানকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে।**

এছাড়াও নতুন নাগরিকত্ব আইন সংশোধনীর মাধ্যমে ৬ (খ) একটি নতুন ধারা সন্নিবেষ্ঠিত করা হয়েছে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনে। ওই ৬ (খ) ধারায় রয়েছে চারটি উপধারা। আর চতুর্থ উপধারায় বলা হয়েছে ৬ (খ) ধারাটি অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, নিজোরাম ও ত্রিপুরার সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল ভুক্ত এলাকাগুলিতে প্রযোজ্য হবে না এবং ১৮৭৩ সালের Bengal Eastern Fronirer Regulation অনুযায়ী ইনার লাইন পারমিট প্রথা যেসব জায়গায় রয়েছে সেইসব জায়গায় সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের ৬ (খ) ধারা প্রযোজ্য হবে না। ইনার লাইন পারমিটের ধারণা কিন্তু এসেছে সেই ঔপনিবেশিক এলাকা থেকে। ইনার লাইন পারমিটের উৎপত্তি ১৮৭৩ সালের বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন অনুসারে। ওই আইন কার্যকর হয়েছিল ১৮৭৩ সালের ২৭ আগস্ট। ব্রিটিশরা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এই আইন করেছিল। এই আইন অনুসারে ভারতীয় কেউ যাতে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কাঁটা হয়ে না দাঁড়ায়, সে কারণে এই ব্যবস্থা ব্রিটিশ চালু

করেছিল। ভারত সরকার যখন এই অইনে চালু রাখে, তখন তার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছিল ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে ওই এলাকায় আদি বাসিন্দাদের সুরক্ষা প্রদান। পূর্বে জম্মু ও কাশ্মীরের লেহ্ জেলার কয়েকটি অংশে ইনার লাইন পারমিট প্রচলন ছিল। ২০১৪-র ১ মে থেকে এই প্রথা বাতিল করা হয়। ২০১৭-তে পুনরায় চালু হয় জম্মু ও কাশ্মীরের লেহ জেলায়। এই ইনার লাইন পারমিটে একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে যা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই উক্ত রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে হবে— অনেকটা বিদেশে প্রবাসের জন্য পাসপোর্ট কিংবা ভিসার মতো অর্থাৎ অভিবাসী পুনর্বাসন কোনভাবেই সম্ভব নয়।

ভারতের সংবিধান হচ্ছে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। এই সংবিধানের ৩৭২ (২) নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ব্রিটিশ সরকারের কোনও আইন পরিবর্তন, সংশোধনের ক্ষমতা থাকবে একমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতির হাতে। ওই ক্ষমতার জন্যই রাষ্ট্রপতি ১৯৫০ সালে চালু করেছিলেন Adaptation of Laws Order, 1950। এই নির্দেশ কার্যকরী হয়েছিল ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে। এই নির্দেশের দৌলতেই দেশের হাতেগোনা কয়েকটি রাজ্যে চালু হয়েছিল 'ইনার লাইন পারমিট'। ইনার লাইন পারমিট চালু হয় নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামে। কিন্তু গত ১১ ডিসেম্বর দ্য অ্যাডাপটেশন অব ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডার ২০১৯ জারি করে বর্তমান অসমের কয়েকটি জেলাকে বাদ দেওয়া হয় এবং মণিপুরকে নতুন রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ইনার লাইন পারমিটের আওতায়। ২০১৯ সালের অ্যাডাপটেশন অব ল (অ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডার জারি করে বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন ১৮৭৩-এর প্রস্তাবনায় বড়ো ধরনের সংশোধন এনেছে কেন্দ্রের মোদী সরকার। ওই সংশোধনীর পূর্বে প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিল অবিভক্ত কামরূপ, দরং, নগাঁও, শিবসাগর, লখিমপুর, কাছাড় জেলা ও নাগা পাহাড়ে প্রয়োজনে ইনার লাইন পারমিট বলবতের কথা। উল্লেখ্য, অবিভক্ত কামরূপ জেলার মধ্যে রয়েছে বর্তমান কামরূপ (গ্রামীণ), কামরূপ (মেট্রো) নলবাড়ি, বরপেটা, বাকসা জেলা, অবিভক্ত দরং জেলার মধ্যে হয়েছে দরং, ওদালগুড়ি, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ, অবিভক্ত নগাঁও জেলার মধ্যে রয়েছে নগাঁও, মরিগাঁও, হোজাই, অবিভক্ত শিবসাগর জেলার মধ্যে রয়েছে শিবসাগর, যোরহাট, গোলাঘাট, চরাইদেউ, অবিভক্ত লখিমপুর জেলার মধ্যে রয়েছে লখিমপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড় এবং তিনসুকিয়া অবিভক্ত কাছাড় জেলার মধ্যে রয়েছে কাছাড়, করিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি। তাই নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে অসমের এই কয়েকটি জেলা বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন ১৮৭৩-র প্রস্তাবনা থেকে বাদ দেওয়া হয়। সংক্ষেপে বলা যায় অসম রাজ্যকে বাদ দেওয়া হয় ইনার লাইন পারমিটের আওতা থেকে। বিগত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট রাষ্ট্রপতির জারি করা নির্দেশ অর্থাৎ বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন ১৮৭৩-এর সম্পর্কিত নির্দেশের সংশোধনীতে সম্মতি জানায়। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে লাগু হয় ইনার লাইন পারমিট প্রথা মণিপুর রাজ্যে। মেঘালয় রাজ্য ক্যাবিনেটে বিগত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে এক সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করে মেঘালয়কে বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন ১৮৭৩-এর আওতায় আনার জন্য।

আবার নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনীর ৭ (খ) ধারার চতুর্থ উপধারায় বলা হয়েছে অসম, ত্রিপুরা, মেঘালয় মিজোরাম ও ত্রিপুরার সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল ভুক্ত এলাকাগুলিতে প্রযোজ্য হবে না। এই চারটি রাজ্যের দশটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদগুলি হচ্ছে— (১) অসম— বড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়েল কাউন্সিল, কার্বিআংলং স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিল এবং ডিমাহাসাও স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিল। (২) মেঘালয়— গারো পাহাড় স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিল, জৈন্তিয়া স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ এবং খাসি পাহাড় স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ। (৩) ত্রিপুরা--- ত্রিপুরা উপজাতি অঞ্চল স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ (৪) মিজোরাম— চাকমা স্বায়ত্তশাসিত জেলা কাউন্সিল, লাই স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ মরা স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদ। এই চারটি রাজ্যের দশটি স্বায়ত্তশাসিত জেলা পরিষদে নাগরিকত্ব সংশোধনীর কোনো সুফল পাওয়া যাবে না। মেঘালয় ট্রান্সফার অব ল্যান্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৭১ অনুযায়ী বিস্তীর্ণ জনজাতি অধ্যুষিত জেলাগুলির কোথাও অ-উপজাতিদের দ্বারা ভূমি ক্রয় বা দখল সম্ভব নয়। সুতরাং নাগরিকত্ব বিলে মেঘালয়েরও প্রভাবিত হওয়ার তেমন কিছু নেই। অথচ গারো, খাসি জনজাতিদের সঙ্গে হিন্দু বাঙ্গালিদের সহাবস্থান অনেক পুরানো। ১৮৬৬ সালে ব্রিটিশ শিলং শহরের গোড়াপত্তন করার সময় হিন্দু বাঙালিদের সেখানে নিয়ে আসা হয়। দেশভাগে বিতাড়িত শরণার্থী বাঙ্গালির অবস্থান এ রাজ্যে নগণ্য। আজকের দিনে মেঘালয়ের মোট জনসংখ্যার আণুবিক্ষণিক আট শতাংশ বাঙ্গালিরা কেবলমাত্র শিলং ও তৎসলগ্ন অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। আজও হোলি, রাসলীলা উৎসব উদযাপনের জন্য মণিপুরীরা নবদ্বীপে যান। তাহলে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ হওয়া হিন্দু ভাই-বোনদের প্রতি সৌহার্দ্যের পরিবর্তে এতো বিরোধিতা কেন? ২০১১ সালে জনগণনা অনুসারে অসমে জনজাতিদের সংখ্যা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির তুলনায় অনেক কম। অসম ও ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠী সংবিধানের ষষ্ঠ তফশিল দ্বারা সুরক্ষিত এবং সেইসব এলাকা নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই কেন্দ্র সরকার অসমে আই এল পি অর্থাৎ ইনার লাইন পারমিট প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইতিমধ্যে সেটা সঠিক ও সময়োপযোগী। অসম রাজ্যের স্বার্থে কেন্দ্রের মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে একটি মহতী পদক্ষেপ। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিধি এখনও প্রস্তুত হয়নি। বিধিতে কী থাকবে সেটাও স্পষ্ট হয়নি এখনও। তাই ষষ্ঠ তফশিলভুক্ত এলাকায় বা ইনার লাইন পারমিটভুক্ত এলাকায় থাকা বাঙ্গালি হিন্দুদের কী হবে, তাঁরা কোথায় এসে নাগরিকত্বের আবেদন জানাবেন, কেমন করে নাগরিকত্ব পাবেন তা নিয়ে দ্বিধা রয়েছে। ইতিমধ্যে ২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে ৬০-টির মতো মামলা হয়েছে। ওই আইনের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশের মধ্যে প্রথম রাজ্য হিসেবে কেরল রাজ্য সরকার দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা করেছিল। সুপ্রিমকোর্ট কোনো স্থগিতাদেশ প্রদান করেনি। তাই কেন্দ্রের ওই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিধি তৈরি করে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদান করতে কেন্দ্রের কোনো বাধা থাকবে না। কিন্তু এই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার আমলে ইনার লাইন পারমিট প্রথা চালু থাকা রাজ্যগুলি অনেকটা আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে পিছিয়ে পড়েবে। অন্যদিকে অসম ও ত্রিপুরা ইনার লাইন পারমিট প্রথার প্রচলন না থাকায় উদ্বাস্তুরা নাগরিকত্ব পেতে যেমন সুবিধা পাবেন, তেমনি সেখানকার আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নও ত্বরান্বিত হবে। ■

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর তীব্র অভিঘাতেই ইংরেজরা ভারত ছেড়েছিল

প্রণব দত্ত মজুমদার

নরমপন্থী কংগ্রেসিদের নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করে গান্ধীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসে কংগ্রেসের হাল ধরার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে এসেছিলেন ১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে। তিনি গুজরাটের সবরমতীতে সত্যাগ্রহ আশ্রম তৈরি করে অহিংসা সত্যাগ্রহের পাঠ দিতে আরম্ভ করলেন। তিনি শিক্ষা দিতেন সত্যাগ্রহীরা মার খেয়ে মরে যাবে কিন্তু কাউকে মারতে পারবে না। তিনি ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিংহের মতো বিপ্লবীদের বিপথগামী বলতেন এবং তাদের কাজকে তীব্র নিন্দে করতেন।

ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন ১৯১৯ সালে কুখ্যাত রাউলাট অ্যাক্টের প্রেক্ষিতে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে। সেই আন্দোলন তিনি মাঝপথেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের চৌরিচৌরাতে সত্যাগ্রহীরা হিংসার আশ্রয় নিয়েছে এই অজুহাতে। কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে খিলাফতকে জুড়ে দিয়ে তিনি মুসলমান তোষণের বিষবৃক্ষটি কংগ্রেসের মধ্যে রোপণ করেছিলেন। এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে মদত দিতে বারণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালা রাজপত রায়, মদনমোহন মালব্য, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিত্ব; কিন্তু গান্ধীজী কর্ণপাত করেননি। তিনি হিন্দুদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হলেও মুসলমানরা তাঁকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করেনি সেজন্য তিনি মুসলমান তোষণের রাস্তা নিয়েছিলেন। হঠাৎ এই আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় মুসলমানরা মনে করল হিন্দুরা চক্রান্ত করে তাদের 'খিলাফত' আন্দোলন ব্যর্থ করে দিয়েছে; মুসলমানদের রাগ গিয়ে পড়ল হিন্দুদের ওপর। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় দাঙ্গা আরম্ভ করে দিল তারা। সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ভারতের মালাবারে। সেখানে মোপালা মুসলমানরা হাজার হাজার হিন্দুর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়, হিন্দুদের হত্যা করে, হিন্দু মা-বোনেদের ইজ্জত নষ্ট করে। কিন্তু গান্ধীজী মোপালাদের নিন্দে করেননি, বরং তাদের ধর্মপ্রাণ মুসলমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আব্দুল রশিদ নামে এক মুসলমান স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে হত্যা করে। এ ব্যাপারেও গান্ধীজী আব্দুল রশিদের কোনো দোষ দেখতে পাননি; স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছিলেন, এই ছিল তাঁর মত।

আন্দোলনের এরকম বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তিতে গান্ধীজী কিছু সময় চুপচাপ থাকলেন। ১৯২৭-২৮ সালে সাইমন কমিশনকে নিয়ে দেশ উত্তাল হয়ে উঠলে আবার আসরে অবতীর্ণ হলেন। ১৯৩০ সালের ১২ মার্চ সবরমতী আশ্রম থেকে 'ডান্ডি' পর্যন্ত পদযাত্রা করে 'লবণ আইন' অমান্য করে দেশ জুড়ে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দিলেন। সারা দেশে সেই আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করেছে সেই সময়ই 'সাইমন কমিশনের' রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করার জন্য লন্ডনে 'Round Table Conference'-এ ডাক পেতেই আন্দোলন মাঝপথে বন্ধ করে দেন এবং ইংরেজের শুভ বুদ্ধির উদয় হয়েছে বলে আলোচনার জন্য লন্ডনে চলে যান এবং কোনো উল্লেখযোগ্য দাবি আদায় না করে খালি হাতে ফিরে আসেন। গান্ধীজীর এই ধরনের আন্দোলনে বহু নেতাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কংগ্রেসের উদীয়মান তরুণ নেতা সুভাষ বলেন— "ইংরেজের সঙ্গে লড়াইয়ে গান্ধীজী ব্যর্থ। এরকম ভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। কংগ্রেসকে নতুনভাবে সংঘর্ষের পথে যেতে হবে; এবং তার জন্য নতুন নেতা চয়ন করতে হবে।" ১৯৩৮ সালে সুভাষ চন্দ্র কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসকে নতুনভাবে গঠন করার কাজে লেগে যান। সুভাষের সংঘর্ষের পথ পছন্দ হলো না গান্ধীজীর। তাই পরের বছর তাঁর অমতে আবার সুভাষ কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় গান্ধীজী ষড়যন্ত্র করে সুভাষকে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। তখন সুভাষ চন্দ্র নতুন পার্টি ফরোয়ার্ড ব্লক তৈরি করেন।

গান্ধীজী তথা কংগ্রেসের শেষ আন্দোলন ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় ৮ আগস্ট এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন গান্ধীজী। ৯ আগস্টে গান্ধীজী-সহ কংগ্রেসের সমস্ত নেতাই বন্দি হয়েছিল। নির্মম ভাবে দমনপীড়ন করে সেই আন্দোলনকে চুরমার করে দিয়েছিল ইংরেজ সরকার। সমস্ত নেতা জেলে থাকায় নেতৃত্বহীন দিশাহীন হয়ে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই স্তব্ধ হয়ে যায়। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সমস্ত নেতারাই জেলে বন্দি ছিলেন। '৪২ পর থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত কোনো আন্দোলনের নামগন্ধই ছিল না। কংগ্রেসের নেতারা বেশিরভাগই বয়সের ভারে আক্রান্ত এবং

হতোদ্যম। মিত্র পক্ষের শরিক ইংরেজ বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী। কথা হলো বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন যখন ইংরেজসেনা জাপানিদের কাছে পরাজিত হচ্ছিল তখন ক্রিপস্ মিশনকে ভারতে পাঠিয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা করে ভারতীয়দের সাহায্য প্রার্থনা করার জন্য। তখনো কিন্তু তাঁরা আলোচনার টেবিলে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়নি। সেই ইংরেজ সরকার বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী হয়েও কেন ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল? সে কি গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহের ভয়ে? না কি তার অন্য কারণ ছিল?

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে ইংরেজ সরকার সুভাষচন্দ্রকে এলগিন রোডের বাড়িতে নজরবন্দি করে রেখেছিল। সুভাষচন্দ্র অসামান্য চাতুর্যের সঙ্গে ১৯৪১ সালের ১৬ জানুয়ারি ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যান। তিনি ছদ্মবেশে আফগানিস্তান, রাশিয়া হয়ে জার্মানি তারপর সেখান থেকে জার্মান সাবমেরিনে ভয়াবহ বিপদসঙ্কুল অভিযান করে জাপানে আসেন। ১৯৪৩ সালের জুলাইয়ের প্রথম দিকে সিঙ্গাপুরে গিয়ে আর এক কিংবদন্তি বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কাছ থেকে আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি 'নেতাজী' নামে ভূষিত হন। তিনি জাপানি সহায়তায় আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গণে ইংরেজ বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং ইংরেজ অধিকৃত বহু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিলেন। তিনি ডাক দিয়েছিলেন 'দিল্লি চলো'। ১৯৪৩ সালের ২১ অক্টোবর তিনি গঠন করেছিলেন অখণ্ড ভারতের 'স্বাধীন আজাদ হিন্দ সরকার'। পৃথিবীর ১১টি দেশ সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সেই অর্থে নেতাজী সুভাষকেই অখণ্ড ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মান্যতা দেওয়া উচিত। ১৯৪৪ থেকে জাপান পরাজিত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট আমেরিকা জাপানের হিরসিমা ও নাগাসাকিতে অ্যাটমবোমা ফেলে। ১৯৪৫ সালের ১৫ আগস্ট জাপান পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে। জাপানের সহায়তায় চলা আজাদ হিন্দ বাহিনী বন্দি হয় ইংরেজ সরকারের হাতে। সুভাষ আবার আত্মগোপন করেন। তার পরবর্তী সত্য এখনো উদ্ঘাটিত হয়নি।

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের দিল্লির লালকেল্লায় যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিচার আরম্ভ হয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য নেতাজী সুভাষ ও তাঁর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দুঃসাহসিক যুদ্ধ ও আত্মবলিদানের কাহিনি জানতে পেরে সারা দেশ উদ্বেল হয়ে উঠলো। তাঁদের বিচার হচ্ছে দেখে দিকে দিকে বিক্ষোভ আরম্ভ হয়ে গেল। ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সেনারা যখন দেখল তাঁদের সহকর্মী সেনারা যারা ব্রিটিশের হয়ে লড়াই করে জাপানিদের হাতে বন্দি হয়েছিল, তাঁরাই আজাদ হিন্দ বাহিনীতে যোগ দিয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন বলিদান করেছে। তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছে তাঁদের যুদ্ধবন্দি হিসেবে বিচার করে ইংরেজ শাস্তি দানের ব্যবস্থা করছে তখন দেশপ্রেমের তীব্র আবেগ তাঁদের মধ্যে সংক্রমিত হলো। তাঁরা বিদ্রোহ আরম্ভ করলে। প্রথমে নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়, তারপর তা স্থলবাহিনী ও বিমান বাহিনীতে ছড়িয়ে পড়ে। নেতাজী সুভাষ আজাদ হিন্দ বাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বেলে দিয়েছিলেন, আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচারের অভিঘাতে তা ইংরেজ বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়ে যেন স্বাধীনতার যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। ইংরেজ অনুধাবন করল এবার তাদের ভারত শাসনের দিন শেষ। "Achinlek now warned his army commanders that they could no longer rely on the soldiers of Indian Army. He warned the Government in London to hestily announce the British departure." (BOSE : An Indian Samurai-Maj.Gen. G.D. Bakshi P. 292). অচিনলেক ছিলেন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফ। আর বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেনের তখন দেউলিয়া অবস্থা। অন্য জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ গোরা সৈন্য এনে এত বড়ো ভারত দখলে রাখা তাদের পক্ষে অসম্ভব। যুদ্ধের পরে ইংলন্ডের শাসনক্ষমতায় এসেছিল ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন লেবার পার্টির সরকার। বিশ্বের ক্ষমতার অলিন্দে তখন নতুন শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকার উত্থান। ব্রিটিশ শক্তির উপর তাদের চাপ ছিল কলোনি গোটাবার। সুতরাং সমস্ত পরিস্থিতি বিচার করে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মানসম্মান নিয়ে ভারত ছাড়ার।

মেজর জেনারেল জি ডি বক্সি তাঁর বইতে লিখেছেন— "Had the Indian Armed forces remained loyal or there had been enough British divisions to keep them in check, the British would never have left India." (p-295)

মাইকেল এডওয়ার্ডস গান্ধীজী সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর 'The Last Years of British India' গ্রন্থে লিখেছেন— "The British felt that they had little to fear from Gandhi himself, they soon recognised him for what he was an anti Indian reformer. As long as Gandhi was in control of Congress, they knew they had ally. As long as civil disobedience remained non-violent, it did not greatly worry the Govenment... মাইকেল এডওয়ার্ডস আরও লিখেছেন-– "The British no longer feared Gandhi or Nehru, but they feared Bose and the violence he represented, and his suddenly amplified figure overawed the conferences that were lead to independence."

অবশেষে দেশবিভাজনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। এটাই ছিল ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির ইতিহাস; গান্ধীজীর অহিংসা আন্দোলন বা ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ভয়ে ইংরেজ ভারত ছেড়ে যায়নি। এই ইতিহাসকে এতদিন ধরে সুচতুরভাবে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ক্লিমেন্ট অ্যাট্লি। তিনি ১৯৫৬ সালে কলকাতায় এসেছিলেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন জাস্টিস পি বি চক্রবর্তী। তিনি নানারকম আলোচনার মাঝে অ্যাট্লিকে জিজ্ঞেস করেন— "১৯৪৭ সালের অনেক আগেই প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন মৃত হয়ে গিয়েছিল এবং তখন ব্রিটিশের ভারত ত্যাগের পরিস্থিতি ছিল না। তাহলে ব্রিটিশ কেন দ্রুততার সঙ্গে ভারত ছেড়ে চলে গেল?" অ্যাট্লি এই কারণ সেই কারণের সঙ্গে মুখ্য যে কারণটি বলেছিলেন তা হলো সুভাষ চন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ বাহিনীর কার্যকলাপ। আজাদ হিন্দ বাহিনীর প্রভাবে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ভিত দুর্বল করে দিয়েছিল। জাস্টিস চক্রবর্তীর পরের প্রশ্ন ছিল— "কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ব্রিটেনের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্তকে কতটা প্রভাবিত করেছিল?" অ্যাটলি অবজ্ঞাসুলভ বক্রোক্তি করে বলেছিলেন— M-I-N-I-M-A-L, অর্থাৎ খুবই সামান্য। ■

এখন কাশ্মীরে স্থানীয় সংখ্যালঘু সমাজের কর্তব্য

বিজয় আঢ্য

স্বাধীনতার ৭২ বছর পর গত ৫ আগস্ট, ২০১৯-এ ভারত সরকারের ৩৭০ ধারা বাতিলের সিদ্ধান্ত শুধু ঐতিহাসিকই নয়, অখণ্ড ভারত চেতনার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এত দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যবস্থা চালু রেখে সব থেকে বেশি ক্ষতি করা হয়েছে কাশ্মীরের বাসিন্দাদের, বিশেষত কাশ্মীরের সংখ্যালঘু সমাজের হিন্দু, শিখ ও বৌদ্ধদের। এই ধারার কারণে দেশের ভিতর আর একটা দেশের মতো যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তা অনাদিকাল ধরে চলতে পারে না। কাশ্মীরি বংশোদ্ভূত রাজনৈতিক ভাষ্যকার শ্রীমতী সুনন্দা বশিষ্ঠ আমেরিকার সংসদীয় প্যানেলে বলার সুযোগ গ্রহণ করে যথার্থই বলেছেন—"There is no Kashmir without India and there is no India without Kashmir". সংসদে ৩৭০ ধারা বাতিল ও কাশ্মীর পুনর্গঠন বিল গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াত বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোদীকে অভিনন্দন জানিয়ে টুইটে লিখেছিলেন, 'ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। সারা জীবন ধরে এটা দেখার জন্যই অপেক্ষায় ছিলাম।' আর প্রাক্তন বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি— 'এতদিনে মেজোকাকার স্বপ্ন পূর্ণ হলো।' মেজোকাকা মানে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

সেই প্রাচীনকাল থেকেই কাশ্মীর ভারতের অঙ্গরাজ্য। ঋষি কশ্যপের নামানুসারে এই কাশ্মীর। কশ্যপ ও কদ্রুর নাগ সন্তানদের স্মৃতি এখনও রক্ষা করছে অনন্তনাগ, ভেরীনাগ ও শেষনাগ। কাশ্মীর বলতে বোঝায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত বর্তমান কাশ্মীর, উপত্যকা, জম্মু, গিলগিট-বালতিস্তান, আকসাই চীন, অধিকৃত কাশ্মীর কারাকোরাম অঞ্চল এবং লাদাখ। পাকিস্তান এবং চীনের অবৈধভাবে অধিকৃত স্থান ছাড়াও বাকি প্রদেশের ভৌগোলিক ক্ষেত্রফল যথাক্রমে কাশ্মীর উপত্যকা ১৫,৮৫৩ কিমি, জম্মু—২৬,২৯৩ কিমি. এবং লাদাখ ৫৯,২৪১ কিমি। ক্ষেত্রফলের বিচারেও কাশ্মীর উপত্যকা রাজ্যের তিনটি ভাগের মধ্যে সব থেকে ছোটো। কাশ্মীর উপত্যকা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ। যদিও এখানে হিন্দু পণ্ডিতেরাও বসবাস করতেন। জম্মু বর্তমানে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর লাদাখ বৌদ্ধ অধ্যুষিত। কাশ্মীরের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ২৫ লক্ষ (২০১১)।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। ১৩৩৯ খ্রিঃ কাশ্মীরে প্রথম মুসলমান শাসক শালমির। পাঁচশো বছর এখানে ইসলামি শাসন ছিল। রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখরা কাশ্মীর দখল করে নেয় (১৫.০৭.১৮১৯)। এরপর ইংরেজরা কাশ্মীর দখল করে নেয় (১৮৪৬)। তারপর ইংরেজদের কাছ থেকে গুলাব সিংহ অমৃতসর চুক্তির (০৯.০৩.১৮৪৬) মাধ্যমে কাশ্মীর কিনে নেন। এরপর চলতে থাকে তাঁদের বংশধরদের রাজত্ব। স্বাধীনতার প্রাক্কালে এখানকার রাজা ছিলেন হরি সিংহ (১৯২৫-১৯৪৭)। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মেহেরচাঁদ মহাজন। হরি সিংহ স্বাধীন ডোমিনিয়নের (স্বাধীন কাশ্মীর) পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করলে হরি সিংহ ভারতীয় সেনার সাহায্য চাইলেন এবং জওহরলাল নেহরুর শর্ত মেনে ভারতভুক্তির চুক্তিতে (Instrument of accession) স্বাক্ষর করলেন। অন্যদিকে ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ও 'মহারাজা কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলনের প্রবক্তা শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পক্ষে থাকলেও আসলে চেয়েছিলেন যে ভারতের ভিতরে থেকে কাশ্মীর কার্যত একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রই হয়ে উঠুক। আর এই কারণেই হিন্দু অধ্যুষিত জম্মুতে ডোগরা সম্প্রদায়ের উপর অকথ্য অত্যাচার শুরু হয়। প্রতিবাদে প্রেমনাথ ডোগরার নেতৃত্বাধীন প্রজা পরিষদ আন্দোলন শুরু করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এইসব দেখেশুনেও নীরব রইলেন এবং তাঁরই সক্রিয় সহযোগিতায় আবদুল্লার ইচ্ছা অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১৭ অক্টোবর সংবিধানের ৩৭০ ধারা সংযোজন করলেন। ঘটনা হলো ১৯৪৮-এর ৪ মার্চ এই শেখ আবদুল্লাকেই কাশ্মীরের প্রধান প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন মহারাজা হরি সিংহ।

৩৭০ ধারার শর্ত মেনে কাশ্মীরের জন্য স্বতন্ত্র সংবিধান স্বতন্ত্র বিচার ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র পতাকার ব্যবস্থা হলো। অর্থাৎ একই দেশে দুই সংবিধান বা দুই বিধান জারি হলো। পৃথক সেনাবাহিনীর দাবি করা হলে নেহরু অবশ্য চক্ষুলজ্জার খাতিরে তা মেনে নিতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে B. N. Mullick তাঁর 'My

years with Nehru : 1948-1964' -এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন, "then suddenly in our utter surprise Nehru started talking bitterly against Sheik Abdulla communalism." কিন্তু তখন তো যা ঘটবার তা ঘটে গেছে।

এই সাম্প্রদায়িকতার বিষ বহন করে নিয়ে চলেছিলেন শেখপুত্র তথা পরবর্তীকালে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা। ১৯৮৯ সালের আগস্ট থেকেই শুরু হয় কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার। ১৯৯০-এর ১৯ জানুয়ারি শুক্রবার রাতে মাইকে ঘোষণা করে পরিবারের মেয়েদের বাড়িতে রেখে কাশ্মীর পণ্ডিতদের চলে যেতে বলা হলো। ওই দিনের পর থেকেই উপত্যকা ছাড়তে শুরু করেন কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ ভূমিপুত্র পণ্ডিত। ৩ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি কাশ্মীরি পণ্ডিত নিজ দেশেই পরবাসী হলেন। ১২০০-র বেশি কাশ্মীরি পণ্ডিতকে (এদের মধ্যে কিছু সংখ্যক শিখও আছেন) হত্যা করা হয়। এইসব শরণার্থীদের জম্মুর উপকণ্ঠে বিভিন্ন শিবিরে থাকতে বাধ্য করা হয়। জম্মুর লাগোয়া পুরখুতে এইরকম এক শিবিরে নিজের চোখে এদের নির্যাতিত জীবনের ছবি দেখে এসেছি। এইসব ত্রাণশিবিরে প্রায় গোরু-ছাগলের মতো তাঁরা জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তিরিশ বছর পার হয়ে গেলেও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের সমস্ত রকম নিরাপত্তা সহকারে উপত্যকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। সেইক্ষণে দেখা একটা সামান্য দৃশ্য মনে পড়ছে। দশ-বারো বছরের সাত-আটজন বালক একটা দোলা কাঁধে নিয়ে নেচে গেয়ে তাঁবুগুলোর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালে উপস্থিতজনরা জানালেন---সামনেই জন্মাষ্টমী। তাই শ্রীকৃষ্ণের পুতুল নিয়ে এরা খেলছে। সামান্য ঘটনা, কী অসামান্য প্রকাশ! এত কষ্টের মধ্যেও নিজেদের পরম্পরাকে ধরে রাখার চেষ্টা মনকে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

৩৭০ ধারা বাতিলের পর জম্মু-কাশ্মীরে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও এখনও কাশ্মীরি পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের কোনো বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। যদিও গত তিরিশ বছর ধরে উদ্বাস্তু জীবনযাপনের পর এখন আশা জেগেছে যে তাঁরা আবার নিজেদের বাসভূমিতে ফিরে যেতে পারবেন। কিন্তু ঘটনা হলো পণ্ডিতদের পুনর্বাসনের বিষয়ে তেমন কোনও সোচ্চার দাবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারকেও এই বিষয়ে নির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদের একটি প্রতিনিধি দল সম্প্রতি কাশ্মীর সফরে গিয়েছেন। তাদেরও এই বিষয়টি দেখতে হবে যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থকরা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে তাদের ডাল আর এখন সহজে গলবে না। যদিও এই অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও জেহাদিরা কিন্তু থেমে নেই।

স্বাধীনতার পর ৭২ বছর ধরে নেহরুবাদী কংগ্রেসি নীতি অনুসরণ করে কাশ্মীর সমস্যার কোনো সমাধান করা যায়নি। কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনে জয়লাভের মূল রসায়ন নিহিত ছিল মুসলমান তোষণের উপর। অথচ বাস্তবে দেখা গিয়েছে সারা দেশে কংগ্রেস ও কিছু রাজ্যে দীর্ঘদিন বামশাসনের পরও সাধারণ মুসলমানরা যে তিমিরে ছিলেন, সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছেন। উপকৃত হয়েছেন আলখাল্লাধারী কিছু ধর্মীয় নেতা। অযথা মুসলমান তোষণ এই দলগুলোর প্রতি হিন্দু সমাজকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। বিজেপি কোনওদিনই মুসলমান তোষণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারা প্রথম থেকেই ৩৭০ ধারা বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে। এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধানের দাবিতে কাশ্মীরে গিয়ে দলের প্রতিষ্ঠাতা ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আত্মবলিদান দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার মুসলমান সমাজকে দেশের মূলস্রোতে যুক্ত করার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ করেছে। দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় এসে মোদী সরকার রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বেও তিন তালাক রদ করতে সমর্থ হয়।

মুসলমান সমাজকে মূলস্রোতে শামিল করানোর ক্ষেত্রে সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই ধারা বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীর দুটি পৃথক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিভক্ত করা হলো—(১) জম্মু-কাশ্মীর ও (২) লাদাখ। আগে এই রাজ্যের যে বিশেষ মর্যাদা ছিল তা আর রইল না। পৃথক পতাকাও থাকবে না। এখন থেকে ৩৬০ ধারা অর্থাৎ অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা জারি করা যাবে। সাধারণ জরুরি অবস্থা অর্থাৎ ৩৫৬ ধারাও এখন প্রযোজ্য হবে। ৩৭০ ধারা বাতিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ৩৫এ ধারাও অকেজো হয়ে গেল। ফলে ভিন্ন রাজ্যের বাসিন্দারাও জমি কিনতে পারবেন। যা তাঁরা আগে পারতেন না। সেখানে বিনিয়োগের দরজা এক ধাক্কায় খুলে যাবে। অমুসলমান অর্থাৎ হিন্দুদের জন্য চাকরি ও শিক্ষায় সংরক্ষণ ছিল না। এখন হিন্দু-শিখ-বৌদ্ধরা সংরক্ষণের আওতায় আসবেন। বিধানসভার মেয়াদ ৬ বছর থেকে কমিয়ে অন্যান্য রাজ্যের মতো ৫ বছর করা হলো। এবার থেকে তথ্যের অধিকার আইন কার্যকর হবে। পৃথক দণ্ডবিধির পরিবর্তে এবার ভারতীয় দণ্ডবিধি লাগু হবে এবং ইতিমধ্যে তা হয়েছেও।

বস্তুত ৩৭০ ও ৩৫এ-র মতো ধারা জম্মু-কাশ্মীরে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাশ্মীরিয়ত ও আঞ্চলিক সংস্কৃতির নামে রাজ্যের সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু সমাজকে অবহেলা ও বঞ্চনা করা হচ্ছিল। কাশ্মীরিয়ত রক্ষার অজুহাতে উপত্যকার রাজনীতির কারবারিরা বাইরের কোনো বিষয় বা ব্যবস্থাকে আমল দেয়নি। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র যে বিপুল অঙ্কের টাকা সাহায্য হিসেবে পাঠিয়েছে তাও রাজ্যের কয়েকটি পরিবার ও শাসকদলের নেতারাই উদরস্থ করেছেন। রাজ্যের দরিদ্র ও প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষরা যে তিমিরে ছিলেন সেই তিমিরেই থেকে গেছেন। পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট (পি আর সি)-এর আওতায় যেসব অবহেলিত মানুষ, যেমন তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি ও অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণী (ওবিসি)-কে জম্মু-কাশ্মীর সরকার যে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার ছাড়পত্র দিয়েছিল আসলে তা অন্য রাজ্যের সাধারণ মানুষ যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন তার বেশি কিছু নয়। পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে যে ৪৩০০ হিন্দু পরিবার মহারাজা হরি সিংহের আমল থেকেই বসবাস করছেন, শরণার্থী হিসেবে রয়েছেন, তাদেরও এই বিশেষ সুবিধা আইনের আওতায় আনা হয়নি। ১৯৫৭ সালে পঞ্জাব থেকে ২০০ বাল্মীকি পরিবারকে সাফাই কর্মচারী (ঝাড়ুদার) হিসেবে জম্মু-কাশ্মীর সরকার নিয়ে এসেছিল। তারা ৬০ বছর পরেও সাফাই কর্মচারীই রয়ে গিয়েছেন। তাদের ছেলে-মেয়েরা সরকার পরিচালিত কোনো স্থানে ভর্তি হতে পারে না। বাল্মীকি পরিবারের শিক্ষিত যুবকেরা শুধু ঝাড়ুদার পদের জন্যই

আবেদন করতে পারে। দেশভাগের কারণে ১৯৪৭ সালে যারা এসেছিল তারা এখনও এই রাজ্যে ওয়েস্ট পাকিস্তানি রিফিউজিজ এবং ত্রাণশিবিরে ক্রীতদাসের মতো বাস করতে বাধ্য হচ্ছে। এরাজ্যে এক লক্ষেরও বেশি বসবাসকারী গোর্খাদের অবস্থাও একই রকম। অথচ এরাই দেশের সুরক্ষার জন্য কখনও আত্মবলিদান দিতে পিছপা হয়নি। সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ মর্যাদা 'পরম বীর চক্র' (পিভিসি) যাঁরা পেয়েছেন, এমন ২১ জন সেনা পরিবারকে তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য একখণ্ড জমিও দেওয়া হয়নি। এমনই এই রাজ্যের আইন! গত ৩০/৩২ বছর ধরে যেসব সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিস কর্মচারী জম্মু-কাশ্মীরে কর্মরত ছিলেন, অবসরের পর তাদের সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেওয়া হয়নি। সংখ্যালঘু হওয়ার কারণেই তাদের এই ললাট লিপি। আর লাদাখের ভাগ্য নির্ভর করেছিল উপত্যকার ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক নেতাদের খেয়ালখুশির উপর। শুনলে আশ্চর্য হতে হবে লাদাখে হাইস্কুল শুরু হয় ১৯৭৩ সালে আর লাদাখের জন্য 'অটোনমাস হিলস কাউন্সিল' প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৭৫ সালে। অথচ আমাদের দেশের অখণ্ডতা রক্ষার ক্ষেত্রে লাদাখ অত্যন্ত স্পর্শকাতর অঞ্চল। পাকিস্তান ও চীন এই দুই দেশের সঙ্গেই লাদাখের সীমান্ত রয়েছে। ১৯৪৮ সালে লাদাখে প্রথম বিমানঘাঁটি তৈরি হয়। পাক অধিকৃত বালতিস্থান থেকে সাহসী লাদাখিরা ৮০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা উদ্ধার করে। সিল্ক রুট (Silk Route) অর্থাৎ কারাকোরাম হাইওয়ে যা লে'র মধ্য দিয়ে গিয়েছে তা খান্ডালা বন্দরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। স্বাধীনোত্তর কালে জম্মু-কাশ্মীরে শাসকেরা সেখানকার সংখ্যালঘু সমাজ অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-খ্রিস্টান সমাজকে কখনও ভালো চোখে দেখেনি। কখনও কখনও যেসব ভালো কথা এদের সম্বন্ধে বলেছে, তা অনেকটা মন্দের ভালো। ইংরাজিতে যাকে 'oxymoronic Expressions' বলে। যেমন, ওনলি চয়েস, ওপেন সিক্রেট, অনেকটা সেইরকম। জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতির একটা ট্যুইটে এই ভাবনারই প্রকাশ দেখি। তিনি টুইটে লিখেছেন— ''What was done to Kashmiri Pandits was very wrong. But does it justify what being done to Kashmiri Muslims today? The present Kashmiri youth were not even born then. To blame them would be like blaming the present Germans for what the Nazis did to the Jews in the 1930s and 40s.''

জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখের উন্নয়নে ৩৭০ ধারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদের মদতদাতারা রাজ্যবাসীকে বারবার ভুল পথে চালিত করছিল। এই ধারা বাতিলের ফলে রাজ্যের সকলেই সমান অধিকার পেল। তাই এখন নতুন জম্মু ও কাশ্মীর গড়ে তোলার জন্য ভিত গড়ার কাজ শুরু করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সংবিধানের ৭০ বর্ষ পালন উপলক্ষ্যে বর্তমান কেন্দ্র সরকার মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপ্যাল অর্থাৎ কর্তব্য পালনের প্রতিও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাই রাজ্যের সংখ্যালঘুরা এখন যেমন কিছু অধিকার লাভ করেছে, ঠিক তেমনই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও বেড়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য যেমন দূরদৃষ্টি ও প্রস্তুতি প্রয়োজন, তেমনই বর্তমানে যে অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেই বিষয়গুলির প্রতিও সচেতন থাকতে হবে। আজকের বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষকে এক সচেতন সমাজ (Knowledge society) হিসেবে গড়ে তোলার জন্য অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরকেও হাত মেলাতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরে সংখ্যালঘু অর্থাৎ মূলত হিন্দুসমাজ এতদিন যে সুযোগ পায়নি, সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করবে এটাই কাম্য।

এই কর্তব্যকর্মে প্রথম প্রয়োজন নবীন প্রজন্মকে কাশ্মীরের মূল শিকড়টি চেনানো। এখন সেখানকার সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষকদের ইতিহাসের পাঠ্যসূচির সেই অংশটি পড়াতে নিষেধ করা হয়েছে যেখানে ডোগরা রাজত্বের কথা লেখা আছে। ইতিহাস পুনর্নির্মাণের নামে হিন্দুধর্ম ও কাশ্মীরি হিন্দুদের বিষয়গুলি পরিকল্পিতভাবে মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কাশ্মীরের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে স্বশাসিত স্কুলগুলির থেকে সরকারি স্কুলগুলিই সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত। তারাই বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ধর্মীয় মৌলবাদীদের সরাসরি সমর্থন করে।

কাশ্মীরি হিন্দুরাই উপত্যকার মূল অধিবাসী এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যে সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে তা ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জেহাদিরা উপত্যকা থেকে বর্তমানে সংখ্যালঘু অর্থাৎ মূলনিবাসী এই হিন্দুসমাজকে সম্পূর্ণভাবে মূলোচ্ছেদ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অপপ্রয়াস রুখতেই হবে। কেননা কাশ্মীর ছাড়া ভারত অসম্পূর্ণ। হিন্দুদের নিজস্ব বাসভূমিতেই তাদের পুনর্বাসন দিতে হবে। এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলিকে। ভারতের অন্যস্থানে তারা বসবাস বা জীবিকার সন্ধান করতেই পারে। কিন্তু তাদের পুরানো সম্পত্তি উদ্ধার করতেই হবে। এটাই প্রথম কাজ।

একইসঙ্গে পাকিস্তানি অপপ্রচার ও অপপ্রয়াসও প্রতিরোধ করতে হবে। জেহাদের কথা প্রচার করে পাকিস্তান একদিকে যেমন উপত্যকার মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, অন্যদিকে প্রশিক্ষিত জঙ্গিদের পাঠিয়ে ভারতীয় নিরাপত্তা কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ নিরীহ মানুষকেও হত্যা করছে। ভারতের বাকি ৫৬০টি দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি যেমন আইনত সিদ্ধ ও অপরিবর্তনীয়, তেমনই মহারাজা হরি সিংহের স্বাক্ষরিত ভারতভুক্তিও (Instrument of Accession) আইনত সিদ্ধ ও অপরিবর্তনীয়। ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা সাময়িক সাংবিধানিক শর্তমাত্র। পাকিস্তানের সব ধরনের ভারতবিরোধী ষড়যন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। আর এই কাজে উপত্যকার সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু সমাজকেই এগিয়ে আসতে হবে। কেননা তারা ঘরপোড়া গোরু। আর এটাই এখন তাদের আশু কর্তব্য।

ভারতভুক্তি দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে সংহত (Integration) করার মধ্য দিয়েই তা সম্পূর্ণ হতে পারে। জম্মু-কাশ্মীর ও লাদাখ ভারতমাতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মহাঋষি কশ্যপ বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে যে শান্তির বাণী উচ্চারণ করেছিলেন সিন্ধু ও ঝিলমের জল আজও তার সাক্ষী হিসেবে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। মহাঋষি কশ্যপের উত্তরসূরী বর্তমানে কাশ্মীর উপত্যকার সংখ্যালঘু হিন্দুসমাজ সিন্ধু ও ঝিলমের নির্মল অবিরল ধারা বহমান রাখবে—এটাই এখন তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ এবং কর্তব্যও। ∎

ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে প্রহসনে পরিণত করেছে মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি

ডাঃ বলরাম পাল

ইদানীং একটা কথা খুব প্রচার হচ্ছে যে ভারত হলো সেকুলার দেশ। বারবার উঠে আসছে সংবিধান প্রণেতা ড. আম্বেদকরের কথা। আরও প্রচারিত হচ্ছে বর্তমান শাসন ব্যবস্থায় সরকার সেকুলার ভারতের টুঁটি টিপে ধরতে উদ্যত। গোয়েবলসীয় প্রচারের কায়দায় মানুষের মনে বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে এমন একটা ধারণা গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যেন ভারত নামক দেশটি স্বাধীনতার পরপরই বা সংবিধান রচনাকালেই ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার ছিল। রাজনৈতিক কূটকৌশল বাদ দিলেও বর্তমান সময়ে আসল সত্যটা তুলে ধরা খুবই জরুরি। উল্লেখ্য, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি থেকে আমাদের নিজস্ব সংবিধান কার্যকরী হয়। সেই সংবিধানের কোথাও ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার বলা হয়নি। সংবিধান প্রণয়নের ২৬ বছর বাদে ১৯৭৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অনৈতিকভাবে ভারতের সংবিধানে ৪২ তম সংশোধনীর মাধ্যমে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি যুক্ত করেন।

এখন প্রশ্ন হলো, অনৈতিকভাবে কথাটা বলা হচ্ছে কেন? যদি আমরা পিছন ফিরে তাকাই, দেশে তখন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। ১৯৭৫-এর ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন এবং ৬ বছর পার্লামেন্টারি রাজনীতি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এই রায়ের প্রেক্ষিতে দেশব্যাপী জয়প্রকাশ নারায়ণ, মোরারজী দেশাই, অটলবিহারী বাজপেয়ী, চৌধুরী চরণ সিংহ, প্রফুল্ল সেন প্রমুখ বিরোধী নেতারা এক দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। আন্দোলন যত প্রসারিত হতে থাকে তত ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতা হারাবার ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং একনায়কতন্ত্রী মনোভাব তাঁর মধ্যে প্রবল হতে থাকে। ক্ষমতা ধরে রাখতে তাঁর পরামর্শে তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ২৫ জুন, ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত ২১ মার্চ ২১ মাসব্যাপী ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন। এই জরুরি অবস্থা ভারতবর্ষের মানুষের রাজনৈতিক, গণতান্ত্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এমনকী সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, মানুষের কথা বলার অধিকারকে পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে হরণ করেছিল। তাই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রবর্তিত জরুরি অবস্থা ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

Maintenance of Internal Security Act অর্থাৎ মিসা (বিনা বিচারে যে কোনো ব্যক্তিকে জেলে পুরে রাখার জন্য নতুন করে মিসা অর্ডিন্যান্স হিসেবে চালু হয়েছিল) প্রয়োগ করে সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক নেতা তথা শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ-সহ সমস্ত প্রতিবাদী মুখকে কারান্তরালে পাঠিয়ে দেন। এই সময় তিনি ক্ষমতার দম্ভে এবং নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত করার প্রয়াসে, ১৯৭৬ সালে বিরোধী শূন্য গণপরিষদে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা ভারতবর্ষকে সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের তকমা দেন। রাতারাতি ভারতবর্ষ হয়ে গেল ধর্মনিরপেক্ষ দেশ।

১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত নেহরু-লিয়াকত চুক্তি ভারতের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে পারলেও পাকিস্তান ব্যর্থ হয়। তাই কোনো দেশকে যদি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ হতে হয় তাহলে তার প্রতিবেশী দেশকেও ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে, নচেৎ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাটাই প্রহসনে পরিণত হয়।

ভণ্ড ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি এরপর থেকে রাজনৈতিক সুবিধা লাভের আশায় এবং ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করার জন্য এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করতে শুরু করে। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, সমাজবাদী, থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায় কে কত বড়ো সেকুলার। ওই সব দলের মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো যে কোনো ভাবে মুসলমান সংখ্যালঘু ভোটকে নিজের দলে কুক্ষিগত করা।

বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আখের গোছাবার আশায় ভারতীয় গণপরিষদে গণতান্ত্রিক নিয়ম কানুনের মধ্যে দিয়ে তৈরি করা আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে মারদাঙ্গা, সরকারি সম্পত্তির ভাঙচুর, লুটপাট এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার প্ররোচনা দিয়ে চলেছে, যা একপ্রকার গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার শামিল।

এখানে একটা কথা না বললেই নয়, ১৯৫০ সালে স্বাক্ষরিত নেহরু-লিয়াকত চুক্তি ভারতের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে পারলেও পাকিস্তান ব্যর্থ হয়। তাই কোনো দেশকে যদি সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ হতে হয় তাহলে তার প্রতিবেশী দেশকেও ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে, নচেৎ ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনাটাই প্রহসনে পরিণত হয়। ■

চিঠিপত্র

অনুপ্রবেশকারীদের তাড়াতেই হবে

ইদানীং খবর পাওয়া যাচ্ছে, নদীয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ২৪ পরগনা প্রভৃতি জেলার সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে প্রতিদিন বাংলাদেশ পালাচ্ছে শয়ে শয়ে অনুপ্রবেশকারী। যারা কাজের তাগিদে দালালের মাধ্যমে এখানে এসে থেকে গেছিল। ভারতে এসে আর ফিরে যাওয়ার নামটি পর্যন্ত করেনি। বর্তমানে এনআরসি আতঙ্কে অনেক ঠিকাদার তাদের দায়িত্ব না নেওয়ায় এরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে নিজ দেশে পাড়ি দিচ্ছে। সংখ্যায় বেশি হওয়াতে বিএসএফের হাতে ধরা পড়ছে। এরা নিজ মুখেই বলেছে কাজের সন্ধানে প্রতিদিন ভারতে ঢুকেছিল। কর্ণাটক পুলিশ ৬১ জন অনুপ্রবেশকারীকে যখন পুশব্যাকের উদ্দেশ্যে হাওড়া স্টেশনে নামায় তখনই বাধে গোল। এই অনুপ্রবেশকারীদের অনেক সুহৃদ জুটে যায় তাদের পুশব্যাক ঠোকানোর জন্য। আমি এটাই বুঝতে পারি না এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের প্রশ্রয় দাতাদের উদ্দেশ্য কী? অনুপ্রবেশকারীদের দরদি মহৎ ব্যক্তির অভাব হয় না, অভাব হয় শুধু হিন্দুদের জন্য। হিন্দুদের তো দেশত্যাগের কোনো ইচ্ছে ছিল না। ভাগ না হলে সবাই ভাই-ভাই মিলেমিশে থাকা যেত। যত অপরাধ কেবল ভারতের বেলায়। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতা এদেশের একটা নীতি। ধর্ম নিরপেক্ষতা না থাকলে কি হিন্দুরা অত্যাচারিত হতো? কখনোই না। হিন্দুরা বলে পৃথিবীর সকল মানুষ সুখী হোক। আর কোনো ধর্মেই সে কথা উল্লেখ নেই। কোনো কোনো ধর্মগ্রন্থের হিসেব মতে হিন্দুরা কাফের, মালাউন। ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে যেখানে সবাই একসময় হিন্দু ছিল, ধর্মান্তরের পর তাদেরই কত তাচ্ছিল্যকর কথা। দেশভাগের পর বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে কোটি কোটি হিন্দু ভারতে এসে নাগরিকত্ব হীন অবস্থায় দিনযাপন করছে, অনেকে এখনো স্থায়ী নাগরিকত্বের তকমা পর্যন্ত পায়নি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ জগন্নাথ সরকার বলেছেন অহিন্দু সমাজের অনেকেই ধর্মভিত্তিক দেশভাগ চায়নি। তাই তারা এদেশে থেকে গেছে। আবার শিয়া সম্প্রদায়ের অনেকেই পাকিস্তান থেকে এসেছে। এই দুই শ্রেণীর সবাই নির্দ্বিধায় নাগরিকতা পাবার যোগ্য। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এ দেশে না এলে এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হতো না। তারা এদেশে এসে মন্দির ধ্বংস এবং হিন্দুদের অহিন্দু রূপ দেওয়াই যত সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাই ৭০ বছর পর মোদী সরকার সেই হতভাগ্য শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন এনেছে। কিন্তু অনুপ্রবেশকারীদের না তাড়াতে পারলে ভারতের বিপদ কাটবে না।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

কিছু ভুলত্রুটি

গত ২০ জানুয়ারি, ২০২০-র স্বস্তিকায় প্রকাশিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়ার পূর্বতন মহানগর সঙ্ঘচালক সদ্যপ্রয়াত ডাঃ সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে আয়োজিত শ্রদ্ধাঞ্জলি সভার সুন্দর সচিত্র প্রতিবেদনটির জন্য ধন্যবাদ জানাই। তবে দু' একটি ত্রুটির প্রতি সবিনয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। প্রতিবেদনে সব কিছুর সযত্ন বিবরণ থাকলেও বাদ পড়েছে হাওড়ার অতি প্রবীণ স্বয়ংসেবক অশীতিপর পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণের উল্লেখ (অথচ প্রকাশিত ছবিতে তিনিই বক্তৃতারত)। স্বয়ংসেবকদের একটি প্রদর্শনী কবাডি ম্যাচের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়ে লেখা সুধীরদার একটি অনবদ্য কবিতাও তিনি পাঠ করে শোনান। সভার সঞ্চালক রথীন্দ্রমোহন (নাথ নয়) বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাওড়ার পূর্বতন মহানগর সঙ্ঘচালক (সহ নয়)। প্রধান শিক্ষক শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় হাওড়া পুরসভার পূর্বতন মেয়র পারিষদ (বর্তমান নয়)। যে অনাথ আশ্রমটির সঙ্গে সুধীরদার সুদীর্ঘ যোগ ছিল, তার নাম শিবপুর রামকৃষ্ণ দরিদ্র ভাণ্ডার।

—সঞ্জিত দে,
শিবপুর, হাওড়া।

স্বস্তিকার প্রচার প্রসার আরও কাম্য

স্বস্তিকা সংগ্রহ করি প্রতি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শ্যামবাজারে। পাঠের আবেগ বহু বছর থেকে আছে। পাঠে পরিতৃপ্ত হই, লিখে গরিবিত। দুঃসাহসিক সম্পাদকীয়, 'খোলা চিঠি' দারুণ লাগে। প্রতি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। পাঠক সংখ্যা অনেক, অনেককেই কিনতে দেখি। বিবেকানন্দ সংখ্যা সময় উপযোগী হয়েছে। ৩০ ডিসেম্বর সংখ্যা দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিচয় দিয়েছে। সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রম, নিষ্ঠার তুলনা নেই। স্বস্তিকার আরও প্রচার ও প্রসার আমাদের কাম্য। স্পষ্ট ভাষায় স্পষ্ট কথা বলছেন। একই নীতি ভর করেই তো চলছেন।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

স্বস্তিকা চিহ্নের উৎস

ঋকবেদের ইঙ্গিত অনুযায়ী স্বস্তিকা চিহ্ন সূর্যের। তবে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়নি। তাই বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যাই হোক, কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

রাতের অন্ধকারে মানুষ-সহ সব প্রাণী যে যার মতো স্থানে আশ্রয় নিত। অন্ধকারে ভয়ে ভয়েই থাকতো। সকালে সূর্য উঠলে সকলের মনে আনন্দের ধারা বয়ে যেত। স্বস্তি পেতো সবাই। বেশি দূরে নয়, শীতে বা বর্ষায় কয়েকদিন সূর্য না উঠার পর, সূর্য উঠলে কী আনন্দই না হয় আমাদের। শুনেছি ঠাণ্ডার দেশ ইউরোপে সূর্য উঠলে মানুষ আনন্দে নেচে ওঠে। বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সূর্য শুরু থেকেই মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে যা আজ অনুভব করা হয়তো কঠিন। যাই হোক,

স্বস্তিকার আকৃতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক।

বর্তমানে স্বস্তিকার আকৃতি বর্গাকার হলেও প্রথম পর্যায়ে বৃত্তাকারে ছিল। প্রথমে বাঁদিক থেকে ডানদিকে একটি বক্ররেখা টানা হতো। উল্লেখ্য, বক্ররেখায় দুটি বক্রতা থাকত। সহজ কথায় দুটি বক্রতা বিশিষ্ট বক্ররেখা। আবার অনুরূপ বক্ররেখাই উপর থেকে নীচে টানা হতো। এই রেখা প্রথমে আঁকা রেখাকে মাঝখানে ভেদ করে যেত। এইভাবে আঁকা হলে একটা চার বক্রবাহু বিশিষ্ট চক্র তৈরি হতো, এখনও করা যায়। লক্ষণীয়, চক্রের বাহুগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাচ্ছে মনে হবে। ঠিক সূর্য যেমন পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায়। এই চক্রকে সহজভাবে আঁকার জন্য মূলত দুটি সরলরেখা পরস্পরকে ভেদ করে স্বস্তিকা আঁকা শুরু হয়। এটাই হচ্ছে বর্তমানের বর্গাকারের স্বস্তিকা। অর্থাৎ চক্রাকার হলো বর্গাকার। বলা বাহুল্য, সূর্যের মতো স্বস্তিদায়ক সাক্ষাৎ দেবতা পৃথিবীতে আর নেই। ইতিহাসের দিকে তাকালে জানা যাবে, প্রাচীন সব সভ্যতায় পূজ্য হিসাবে সূর্য প্রথম বা গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রয়েছেন। সবদিক দিয়ে বিচার করলে 'স্বস্তিকা' চিহ্নটি স্বস্তিদায়ক সাক্ষাৎ সূর্যেরই।

—**রাজকুমার জাজোদিয়া,**
কালিয়াগঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

নিয়ন্ত্রণহীন বাজারদর থেকে চোখ ফেরাতেই মমতার পদযাত্রার নাটক

যাঁরা একটু সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোরাফেরা করেন, তাঁরা বেশ কয়েকদিন ধরে দেখছেন বাজারের অবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষ কতটা উদ্বিগ্ন। মমতা ব্যানার্জি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বাজারের অবস্থা কেমন ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তাঁর একটা ছবিও তাঁরা তুলে ধরেছেন সোশ্যাল মিডিয়ার সাধারণ মানুষ। বাজারের আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দামের ঊর্ধ্বগতি যে কী পরিমাণ তাঁর একটা পরিচয় তাঁরা দেবার চেষ্টা করেছেন। সামান্য হলে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে এই রাজ্যে। এমনিতেই নানা সমস্যায় জেরবার সাধারণ মানুষ। গত কয়েক মাস ধরে পেঁয়াজ দামের কারণে সাধারণ মানুষের পাত থেকে প্রায় উধাও। রাজ্যের শাসক দলের প্রধান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তোপ দেগেছেন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে। কিন্তু তিনি কী খোঁজ রাখেন না যে তাঁর রাজ্যে উৎপাদিত শাকসবজির দাম কতটা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে? এখন বাজারে নতুন আলু উঠে গেছে। এই সময়ে আলুর দাম, কোথাও ৩৫ টাকা কেজি, কোথাও আবার ৩৬। এটা জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের বাজার দর। মানুষ সামান্য একটা ফুলকপি এই শীতের মেনুতে রাখবেন, ছোটো একটা কপি ২৫ টাকা। বাঁধাকপি ২০ টাকা। বিট, গাজর, বা বিন্‌স অথবা টম্যাটোর কথা নাই বা বলা গেল। এদিকে নিঃশব্দে বিপ্লব ঘটিয়ে বেড়েছে দুধের দাম। রাজ্যের কিছু পেইড মিডিয়ার লক্ষ্য এসব দিকে নেই। তাঁরা এখন ব্যস্ত তৃণমূল সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে যে পদযাত্রা করছেন সেদিকে। এখন তৃণমূল সুপ্রিমোর একটাই বিষয় নিয়ে মানুষের দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা। বাজারদর নিয়ে যে সমস্যা এখন সাধারণ মানুষ তাঁর রাজ্যে ভোগ করছেন, সেটা যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে, সেইদিক থেকে একেবারে নজর ঘোরাবার চেষ্টা করে চলেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

সাধারণ মানুষ মনে করছেন বাজারের নিয়ন্ত্রণ একেবারেই লাগামছাড়া হয়ে গেছে রাজ্যের প্রশাসনের। সেটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই মমতা এই পদযাত্রা করছেন। ২০০৫ সালে তিনি রাজ্যে অনুপ্রবেশ নিয়ে খুব বেশি সরব ছিলেন। এখন হঠাৎ কেন তাঁর অবস্থান উল্টো হয়ে গেল, সেটা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সাধারণ মানুষ। তাঁরা বলছেন পেঁয়াজ না হয় বাইরে থেকে আসছে। আলু, কপি বা কাঁচা শাকসবজি, সেগুলিও কি বাইরে থেকে আসছে?

কিছুদিন আগে তৃণমূল সুপ্রিমো তাঁর জীবনের সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন গঙ্গা সাগরে। সেদিন ছিল বাঙ্গলা বনধ। সেদিন বনধকারীদের উদ্দেশ তিনি বলেন, সস্তার পাবলিসিটি পেতে চাইছেন বনধের সমর্থকরা। তাদের ওই দিনকার নানা হিংসাত্মক কাজ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে, তিনি একথা বলেছিলেন। কার্যত দেখা যাচ্ছে তৃণমূল সুপ্রিমো সাধারণ মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সুড়সুড়ি (নাগরিকত্ব চলে যাবার ভয়) দিয়ে একটা গিমিকের রাজনীতির হাওয়া তুলে, সস্তা প্রচারের রাস্তায় হেঁটে, রাজ্যের মানুষের ভাতের পাতের সমস্যা থেকে নজর ঘুরিয়ে দেবার একটা ঘৃণ্য খেলায় নেমেছেন।

তিনি এটা বুঝেছেন যে এবার মানুষ তাঁকে এই বাজারের সবজির দামের ঊর্ধ্বগতি নিয়ে প্রশ্ন করবে। তার উত্তর দেওয়া তাঁর পক্ষে খুব একটা সহজ হবে না। অন্যদিকে রাজ্যের অন্যান্য সমস্যা তো রয়েইছে। ২০১১ সালে যখন তৃণমূল ক্ষমতায় আসে, সেই সময়ের থেকে ২০১৯ —এই আট বছরের শেষে বাজারের শাকসবজি থেকে চাল সব কিছুর দামের ঊর্ধ্বগতি অব্যাহত। প্রায় গত আট বছরে আলু থেকে সব সবজির দাম বেড়েছে ৩০০ শতাংশ। সেটাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা দূরে থাক। তিনি এখন কিলোমিটারের পর কিলোমিটার হেঁটে মানুষকে নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে বোঝাচ্ছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, এই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল আমাদের রাজ্যের বাসিন্দাদের কাছে কখনই বিপদ হয়ে দেখা দেবে না। আর এনআরসি, সেটাও সেই পরোক্ষ ভাবে ২০০৫ সালের মমতা ব্যানার্জির দাবি পূরণ হয়েছে বলে মনে করে রাজনৈতিক মহল। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, এই নাগরিকত্বের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ভয় ঢোকাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এটাই মনে করেন সাধারণ মানুষ।

সামান্য সবজি খাবার অধিকার কেড়ে নেবার জন্য সাধারণ মানুষ দোষ দিচ্ছেন তৃণমূল সরকারকেই। সাধারণ মানুষ বলছেন, ফড়েরাজ ভাঙার মতো ক্ষমতা এই সরকারের নেই। যেমন আজও ভাঙতে পারা যায়নি সিন্ডিকেট রাজ। আর কাটমানি খাওয়াও বন্ধ করা যায়নি। তেমনি এই সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের থেকে বেশি প্রিয় সিন্ডিকেট রাজ আর ফড়েরা।

—**স্বপন দাস,**
ব্যান্ডেল, হুগলী।

অঙ্গনা

স্বামীজীর ভাবনায় সীতা মূর্তিমতী ভারতমাতা

সুতপা বসাক ভড়

“ভারতীয় রমণীগণের যেরূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ। রমণী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতার চরিত্রে কেন্দ্রীভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তভূমিতে এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া তিনি এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা স্বয়ং শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধতর, সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ। সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সেই মহাদুঃখের জীবনযাপন করিয়াছিলেন, সেই সাধ্বী, সেই সদাবিশুদ্ধ-স্বভাব আদর্শ পত্নী সীতা নরলোকের, এমনকী, দেবলোকের পর্যন্ত আদর্শভূতা, সহনীয়চরিত্রা। সীতা চিরদিনই আমাদের জাতীয় দেবীরূপে বর্তমান থাকিবেন। আমরা সকলেই তাঁহার চরিত্র বিশেষরূপে জানি। সুতরাং উহার বিশেষ বর্ণনার আবশ্যক পড়ে না। আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমনকী, আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইবে পারে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ভারতে অতিশয় গ্রাম্য ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন; প্রত্যেক হিন্দু নর-নারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান। আমাদের নারীগণকে আধুনিকভাবে গঠিত করিবার যে-সকল চেষ্টা চলিতেছে, যদি সে-সকল চেষ্টার মধ্যে তাহাদিগকে সীতা-চরিত্রের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হইবে ভারতীয় নারীগণকে সীতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আপনাদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে— ইহাই ভারতীয় নারীর উন্নতির একমাত্র পথ।” —ভারতীয় মহাপুরুষগণ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড।

“ভারতের বালক-বালিকাগণ, বিশেষত বালিকামাত্রেই সীতার পূজা করিয়া থাকে। ভারতীয় রমণীগণের সর্বাপেক্ষা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা— পরমবিশুদ্ধ স্বভাবা, পতিপরায়ণা, সর্বংসহা সীতার ন্যায় হওয়া। এই সমুদয় চরিত্র আলোচনা করিবার সময় আপনারা পাশ্চাত্যের আদর্শ হইতে ভারতীয় আদর্শ কতদূর ভিন্ন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সমগ্র ভারতবাসীর সমক্ষে সীতা যেন সহিষ্ণুতার উচ্চতম আদর্শরূপে বর্তমান রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশ বলে— কর্ম কর, কর্ম করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। ভারত বলে— দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শক্তি দেখাও। মানুষ কত অধিক বিষয়ের অধিকারী হইতে পারে, পাশ্চাত্য দেশ সেই সমস্যার পূরণ করিয়াছে। ভারতে এদিকে মানুষ কত অল্প লইয়া থাকিতে পারে, এই সমস্যার পূরণ করিয়াছে। এই দুইটি আদর্শই এক এক ভাবের চরম সীমা। সীতা যেন ভারতীয় ভাবের প্রতিনিধিস্বরূপা, যেন মূর্তিমতী ভারতমাতা! সীতা বাস্তবিক ছিলেন কিনা, সীতা উপাখ্যানের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা, এ বিষয় লইয়া আমরা বিচার করিতেছি না। কিন্তু আমরা জানি সীতা- চরিত্রে যে আদর্শ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই আদর্শ ভারতে এখনো বর্তমান। সীতা চরিত্রের আদর্শ যেমন সমগ্র ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, যেমন সমগ্র জাতির জীবনে, সমগ্র জাতির অস্থিমজ্জায় প্রলেপ করিয়াছে, যেমন উহা প্রত্যেক শোণিত-বিন্দুতে পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়াছে, অন্য কোনো পৌরাণিক উপাখ্যান তেমন করে নাই। সীতা-নামটিও ভারতে যাহা কিছু শুভ, যাহা কিছু বিশুদ্ধ, যাহা কিছু পুণ্যময়, তারই পরিচায়ক। নারীগণের মধ্যে আমরা যে ভাবকে নারীজনোচিত বলিয়া শ্রদ্ধা ও আদর করিয়া থাকি, সীতা বলিতে তাহাই বুঝাইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ যখন স্ত্রীলোককে আশীর্বাদ করেন, তিনি তাহাকে ‘সীতার মতো হও’ বলিয়া থাকেন; বালিকাকে আশীর্বাদ করিবার সময়ও তাহাই বলা হয়। ভারতীয় রমণীগণ সকলেই আপনাদিগকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা, নিত্য-বিশুদ্ধ-স্বভাবা রামভার্যা সীতার সদৃশই জ্ঞান করিয়া থাকেন। তিনি এত দুঃখ সহিয়াছেন, কিন্তু রামের উদ্দেশে একটি কর্কশ বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া কখনো নির্গত হয় নাই। এই সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করা তিনি নিজ কর্তব্যরূপে মনে করিয়া লইয়াছেন এবং স্থির-শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া গিয়াছেন। সীতার অরণ্যে নির্বাসন-ব্যাপার তাঁহার প্রতি কী ঘোর অবিচার ভাবিয়া দেখুন, কিন্তু তন্নিমিত্ত তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র বিরক্তিভাবের উদয় হয় নাই। এইরূপ তিতিক্ষাই ভারতের বিশেষত্ব।... ভারতের এই বিশেষ ভাবটি সীতার প্রকৃতিগত ছিল। তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধের চিন্তা পর্যন্ত কখনো করেন নাই। —রামায়ণ, স্বামীজীর বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড। ■

দাড়ি কামানো থেকে রোগ

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

গোঁফ আর দাড়ির জোরে এগিয়ে পুরুষ। তাতে পুরুষের পৌরুষ। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, স্বভাবের নরম-গরম প্রকাশ লুকিয়ে আছে এর আড়ালেই। কেউ দাড়ি-গোঁফ না কামিয়েই স্মার্ট। কারও ক্ষেত্রে আবার নিয়মিত দাড়ি-গোঁফ শেভ করলে তবেই হ্যান্ডসাম লুক। এখন অল্প বয়স থেকেই ছেলেদের এই দাড়ি কামানোর প্রতি অদ্ভুত প্যাশন চোখে পড়ে। তবে শুধু স্টাইলের দিকে লক্ষ্য দিতে গিয়ে কোনও কারণে দাড়ি কামানোর অস্ত্রটির প্রতি অবহেলিত হন তবে বিপদ আসবে চুপিসারে।

কীভাবে? ক্ষুর বা রেজার বাহিত :

দাড়ি কামানোর সময় যাঁদের ত্বক কেটে যায় (সে কাটা অল্প হলেও সমান বিপজ্জনক) তাঁদের রোগ সংক্রমণের সম্ভাবনা বেশি। সুস্থ চর্ম সেদিক থেকে অনেকটা নিরাপদ। যদি কারও রেজার ব্যবহারের সময় বারবার ত্বক কেটে যায় ও সেই রেজারই যদি অন্য আর একজন ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে বিশেষ কিছু সংক্রমণ এক শরীর থেকে অন্য শরীরে ছড়াতে পারে। এক্ষেত্রে যদি দ্বিতীয় জনের ক্ষুরটি ব্যবহারের সময় ত্বক নাও কাটে সেক্ষেত্রে পূর্ব ব্যবহারকারীর লেগে থাকা রক্ত থেকে দ্বিতীয় জনের শরীরে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। তাই একজনের ব্যবহৃত রেজার অন্যজনের ব্যবহার করা উচিত নয়। যদিও বা ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রে রেজার বা ক্ষুরের ব্লেডটি পাল্টে তবেই ব্যবহার করা নিরাপদ। ব্যবহারের আগে ব্লেড পাল্টানোর পাশাপাশি ক্ষুরটিও (ডেটল বা সুদল) দিয়ে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।

এক গবেষণায় এমন তথ্যই মিলেছে যে, বিভিন্ন ক্ষুর ব্যবহারের পর ত্বক ভালো রাখতে যে ফিটকিরি ব্যবহার করা হয় তা থেকেও সংক্রমণ ছড়াতে পারে।

ত্বকের রক্ত ফিটকিরিতে লেগে থাকলে তা অন্যের ত্বকে লাগালে সংক্রমণ ছড়ায়। কোনও কেটে যাওয়া বা ফুসকুড়ি থেকে রক্ত বের হলে তা থেকে হেপাটাইটিস সি ভাইরাস সংক্রমিত হয়। এই ক্ষেত্রে এটা মনে রাখা দরকার যে, দাড়ি কামানোর সময় যদি নাপিতের থেকে কোথাও কেটে যায় তখনও কিন্তু নাপিতের থেকে (যদি তারও এই ধরনের সংক্রমিত রোগ থাকে) রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা থাকে।

কী কী রোগ সংক্রমিত হয়?

মূলত যে রোগগুলি রক্তের মাধ্যমে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে সংক্রমিত হয়, সেই রোগগুলি হলো—

• **এইচআইভি, হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি**— এই সবকটি মারাত্মক রোগ। যার মধ্যে প্রথমটির ক্ষেত্রে একবার সংক্রমিত হলে সারাজীবনই সেই আক্রান্ত মানুষটি এইচআইভি পজিটিভ রয়ে যায়। এছাড়া বিভিন্ন চর্ম রোগও এই মাধ্যমে ছড়াতে পারে। সেই রোগগুলি হলো—

• **স্ট্যাফ ইনফেকশন :** স্ট্যাফিলোকক্কাল ব্যাক্টেরিয়ার রোগ। এই ব্যাক্টেরিয়া ত্বকে সংক্রমণ ছড়ায়।

• **মলিউস্কাম ইনফেকশন :** যাকে ওয়াটার ওয়ার্টও বলা হয়। এটিও একটি ভাইরাস সংক্রমণ।

সাবধানতা :

• সেলুনে দাড়ি কামানোর আগে দেখে নেবেন নাপিত যেন ক্ষুরের ব্লেড পাল্টায়, তার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুরটা ভালো করে কোনও অ্যান্টিসেপটিক ডিস-ইনফেকট্যান্ট দিয়ে ধুয়ে নেয়।

• নাপিতের কাছের ফিটকিরি কখনও ব্যবহার করবেন না।

• কামানোর সময় যদি নাপিতের কোথাও কেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ব্লেড পাল্টানো ও ক্ষুর ধুয়ে নেওয়ার প্রয়োজন।

• বাড়ির অন্য কারও বা বন্ধুদের রেজার ক্ষুর ব্যবহার করবেন না।

• ঘরের রেজার বা ক্ষুর ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে রাখা প্রয়োজন। এছাড়া ব্যবহার করার আগেও ভালো করে ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে মহিলাদের মধ্যেও রেজার ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায়। তাই তাঁদের এই সতর্কতা মেনে চলা জরুরি।

যুগদ্রষ্টা দুই মহাপুরুষ
স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও ডাঃ হেডগেওয়ার

অদ্বৈত দত্ত

মানব সেবায় স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হিন্দু সমাজের জাগরণ প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রণবানন্দজীর সেই মহাসত্যের আর একটি দিব্য অভিব্যক্তি— হরিজন নয়, অচ্ছুত নয়, দরিদ্র নারায়ণ সেবা— এই ভাবনা নিয়েই তাঁর জয়যাত্রা। গ্রামে শহরে সর্বত্র সর্বশ্রেণীর হিন্দুদের নিয়ে তিনি স্থাপন করেন হিন্দু মিলন মন্দির। তাঁর গঠনমূলক সংগঠন চিন্তা হিন্দুর মহাজাগরণ আজ ভারতের সর্বত্র পরিলক্ষিত। কেবল ধর্মগুরু হয়েই থাকা নয়, তাঁর চিন্তা হিন্দু সমাজকে তথা ভারতবর্ষের ঋষি পরম্পরাকে রক্ষা করা। সব শহরে আশ্রম, মঠ, হিন্দু মিলন মন্দির; গড়ে উঠেছে চারণ দল, রক্ষীদল, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসীদল। এই ভূমিকা শতবর্ষ ধরেই চলছে। তার অমর বাণী প্রতিধ্বনিত হচ্ছে আজও— সর্বত্র। আমরা দেখেছি তার বাণী সত্যে পরিণত হয়েছে— এ যুগ মহাজাগরণের যুগ, এ যুগ মহাসমন্বয়ের যুগ, এ যুগ মহামিলনের যুগ, এ যুগ মহামুক্তির যুগ।'

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ জানুয়ারি (বাংলা ১৩০২) তাঁর জন্ম। বাল্য নাম ছিল বিনোদ। বাবা ডাকতেন বুধো বলে। তাঁর জন্মের পর পিতা বিষ্ণু ভুঁইয়া জমি সংক্রান্ত মামলায় জয়লাভ করেন। তাই তাঁর নাম রাখেন জয়নাথ। এই রুদ্র অবতার পুরুষ ছোটো থেকে থাকতেন ধ্যানমগ্ন— সমাজ সংস্কার ও হিন্দু রক্ষার চিন্তায় মগ্ন।

স্কুলজীবনে শিক্ষকদের স্নেহধন্য ছিলেন। গভীর বিষয়ে ডুবে থাকতেন। আলুসিদ্ধ ভাত আর ব্রহ্মচর্য সাধনায় হস্তির বল —তাঁর

গুণগ্রাহীগণের আলোচ্য বিষয় ছিল। দুর্বলের উপর মুসলমান দুর্বৃত্তের হামলার প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উচিত শিক্ষাদানের মাধ্যমে সিংহ বিক্রমের সমস্ত পদক্ষেপ তাঁর বাল্যকালেই পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশী আন্দোলনে সহায়তা, পথ প্রদর্শন, জেলে গমন সবই ঘটেছে তাঁর জীবনে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে বিজয়া দশমীর পরেরদিন গোরক্ষপুর মঠের গম্ভীরানাথজীর নিকট সাধন দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর অন্যতম কাজ তীর্থসংস্কার। তীর্থক্ষেত্রে পাণ্ডাদের শোষণ মূলক আচরণ তাঁকে ব্যথিত করে। তাই দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা তীর্থযাত্রীদের ঠিকমতো ধর্মাচরণ ও ধর্মীয় রীতি পালনের অধিকার প্রদানের জন্য তীর্থপাণ্ডাদের অপচেষ্টা বন্ধ করেন। তীর্থযাত্রীদের ওপর উৎপীড়ন বন্ধ করার কাজ তাঁর জীবনের এক বড়ো কলঙ্ক মোচন অধ্যায়।

সত্যদ্রষ্টা যুগপুরুষ ছিলেন শ্রীমৎস্বামী প্রণবানন্দজী। অখণ্ড বঙ্গদেশের পরিস্থিতি হিন্দু জীবনের সংকটকালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ মৃতপ্রায় হিন্দু জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের অনুগামীরা এ যুগে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজের ভাষা-প্রান্ত-জাতি-বর্ণ-উঁচু-নীচু ভাব ভুলে জাতি গঠনের কাজে রত। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে বহুবার আলাপ-আলোচনা করেছেন স্বামী প্রণবানন্দজী। তিনি নিজের গলার মালা শ্যামাপ্রসাদের গলায় পরিয়ে তাঁকে হিন্দুদের নেতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর কথাতেই শ্যামাপ্রসাদ জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। স্বামী প্রণবানন্দজী বুঝেছিলেন সংগঠন ছাড়া সমাজকে গড়ে তোলা অসম্ভব। সেইজন্য ডাক্তার হেডগেওয়ার এবং প্রণবানন্দজীর আহ্বান— মানুষ হতে হবে। সত্যিকারের মানুষের মতো মানুষ হওয়া, আচরণে তা প্রকাশিত করা। স্বামী বিবেকানন্দ ঘোষণা করেছিলেন মানুষ চাই, মানুষ হলেই সবকিছু হয়ে যাবে। স্বামী প্রণবানন্দজী ধর্মগুরু হয়ে শুধু উপদেশ নয়, জাতির কল্যাণের জন্য বেছে নিয়েছিলেন কঠিন দুর্গম পথ। স্বামী প্রণবানন্দজীর ভাবনায় ছিল— নমঃশূদ্র, ধীবর, রজক কিংবা সাঁওতাল, বাউরী, সবার উন্নয়নের প্রচেষ্টা। সবার বৈদিক মন্ত্রচারণের অধিকার আছে, সবার যজ্ঞ বেদীতে আহুতি দেবার অধিকার আছে। হিন্দু যুবকদের জাতিগত ভেদভাব ভুলে সমস্ত হিন্দু সমাজ রক্ষার সংকল্প গ্রহণ। ব্যায়াম করে শক্তি অর্জন করে অস্ত্র সঞ্চালনের অভ্যাস করা। তাঁর আশা, সমস্ত হিন্দু গুরুগোবিন্দ সিংহের মতো শক্তির আরাধনা করবে। তাঁর সংকল্প ছিল স্বাবলম্বী সংগঠিত হিন্দু সমাজ জাতিগত ভেদভাব ভুলে এক অখণ্ড সমাজের স্বপ্ন দেখবে। ■

খেলার মাঠে আইডেন্টিটি ধ্বংসের স্লোগান

দেবাশিস লাহা

It would not be impossible to prove with sufficient repetition and a psychological understanding of the people concerned that a square is in fact a circle. They are mere words, and words can be molded until they clothe ideas and disguise.

—Joseph Goebbels (Nazi propaganda Minister)

একই বিষয় যদি বার বার উচ্চারণ করা হয় এবং সেই পুনরাবৃত্তিটি যদি যথেষ্ট মাত্রায় ঘটে, তবে জনগণের মনেও দিব্যি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যে, একটি চতুর্ভুজ আসলে বৃত্তই। এসব প্রতীতি নিছক শব্দের অভিব্যক্তি, আর কে না জানে শব্দকেও ভাবনার ছদ্মবেশ পরিয়ে ইচ্ছেমতো বদলে নেওয়া যায়। —জোসেফ গোয়েবল্‌স (নাজি প্রচার প্রমুখ)

সাম্প্রতিকতম ডার্বি ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারিতে কতিপয় এসএফআই সমর্থকের 'মহানুভবতার নিদর্শন হিসেবে' 'রক্ত দিয়ে কেনা মাটি, কাগজ দিয়ে নয়' খচিত ব্যানারটি দেখে আমার জোসেফ গোয়েবলসের কথাই মনে পড়ছে। কী ভাবছেন? বাড়িয়ে বলছি? একদম নয়। একই মিথ্যা যদি বার বার উচ্চারণ এবং প্রচার করা হয়, কালক্রমে সেটিই সত্য বলে বিবেচিত হবে, (বাংলায় যাকে দশচক্রে ভগবান ভূত বলা হয়ে থাকে। পরিকল্পিতভাবে একটি ছাগলকে কীভাবে কুকুর বানিয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ সত্যকে মিথ্যা, এই মর্মে একটি নীতিকথার গল্পও আছে।) এই গোয়েবলসীয় রণকৌশলটিকে নাজিরা যতটুকু কাজে লাগাতে পেরেছে, তার লক্ষ কোটি গুণ কাজে লাগিয়েছে মার্কসবাদী বামপন্থীরা। বলাই বাহুল্য নাগরিক আইনের বিরোধিতা করে অনুপ্রবেশকারী মুসলমানদের আড়াল করা এবং প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যেও নাজি প্রচার মন্ত্রীর মুখটিকেই বার বার দেখতে পাই। সংখ্যালঘু অধিকারের নাম করে মুসলমান সমাজের 'নয়নের মণি' হয়ে ওঠার প্রচেষ্টা করা রাজনৈতিক দলগুলি (ডান-বাম নির্বিশেষে) নিছক ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির স্বার্থেই এই অবস্থান নিয়েছেন এমন ভাবা ভুল হবে। নিছক নির্বাচনে জেতা একটি রণকৌশল মাত্র! তবে উদ্দেশ্যটি কী? ভারত নামক রাষ্ট্রটি, যা পেগান অর্থাৎ বহুত্ববাদীদের (পড়ুন হিন্দু ধর্মাবলম্বী) সর্বশেষ ভূখণ্ড হিসেবে অদ্যাবধি টিকে আছে, তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা। দুটি আব্রাহামিক মতকে (খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলাম। মতবাদ বলাই শ্রেয়) ষড়যন্ত্রের দোসর বানিয়ে মার্কসবাদীদের এই কার্যক্রম ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে অনেক মানুষই ধরে ফেলেছেন। কীভাবে? খুব সহজ উত্তর। গণতন্ত্র এবং তথাকথিত মেকি ধর্মনিরপেক্ষতাকে (যা ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তোল্লা দিয়ে গোল্লায় পাঠায়) মূলধন করে এদেশের ডেমোগ্রাফি অর্থাৎ জনবিন্যাসের সুবিধাজনক পরিবর্তন সাধন। ইংরেজিতে যাকে demographic shift বলা হয়। যে পদ্ধতি অবলম্বন করেই ৫৭টি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের প্রায় ২৫ শতাংশ জমি ইসলামের দখলে আনা সম্ভব হয়েছে। আর এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ওরা এদেশের ইতিহাস থেকে শুরু করে চিন্তন, মনন, সংস্কৃতিকেও হয় বিকৃত করেছে, নয় ধামাচাপা দিয়েছে। স্বাধীনতার পর পরই শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এবং জওহরলাল নেহরুর হাত ধরে যে শিক্ষাব্যবস্থাটির জন্ম হয়, সেটিও এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার একটি কৌশল ছিল, এমন মতও উঠে আসছে। খেলার মাঠে এসএফআই ছাত্র সংগঠনের এই 'মানবিকতাও' সেই বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ মাত্র। কীভাবে? মোটামুটিভাবে দুটি পদ্ধতিতে (১) 'ধর্মনিরপেক্ষ' (যদিও সেকুলার শব্দটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, জরুরি অবস্থার আবহেই সংবিধানের প্রস্তাবনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ প্রাথমিক অবস্থায় এর অস্তিত্বই ছিল না। স্বয়ং আম্বেদকর এই অন্তর্ভুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেন।) সংবিধানের সুযোগ কাজে লাগিয়ে একটি বিশেষ ধর্মের লাগামহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তার সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদেরও (এই বিশেষ ধর্মের) এদেশে বসবাস এবং সংখ্যাবৃদ্ধির অধিকার দেওয়া। এভাবেই এ রাজ্যটি বিগত কয়েক দশকে সংখ্যালঘু বৃদ্ধির বিপুল হার প্রত্যক্ষ করেছে। ২০১১ সালের জনগণনা হিসেবেও যা প্রায় ২৮ শতাংশ! এমন একটি জনগোষ্ঠীর বাড়বাড়ন্ত যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠলে সর্বাগ্রে গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাই বিপন্ন হয়। (২) ইতিহাস ধামাচাপা দেওয়া অথবা বিকৃত করা। যা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সূত্রপাত ঘটলেও কালক্রমে ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াকেও এই দেশবিরোধী শক্তি ফসিল ফুয়েলের দাপটে করায়ত্ত করে ফেলেছে। দেশভাগের প্রকৃত কারণ, নোয়াখালির পৈশাচিক হিন্দু হত্যা যা কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিন পরিকল্পিতভাবে সংঘটিত করা হয়, এমনকী গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামক সুরাবর্দি, বাম, জেহাদি রচিত নরমেধ যজ্ঞ যা গোপাল মুখার্জির (গোপাল পাঁঠা) নেতৃত্বে ব্যর্থ করা সম্ভব হয়েছিল— এই জাতীয় যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহকে অস্বীকার অথবা বিকৃত করে নতুন প্রজন্মকে অন্ধকারে রাখার সুচিন্তিত প্রয়াস। শুধু কি তাই? বাঙ্গালি হিন্দুর অগ্রগণ্য পরিত্রাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেও চরম নেতিবাচক আলোকে চিত্রিত করতেও এদের রুচিতে বাঁধে না! তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের সঙ্গে যে মেঘনাদ সাহা, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, যদুনাথ সরকারের মতো মনীষীও একমত হয়েছিলেন সেই সত্যটিও বেমালুম চেপে দেওয়া হয়।

আসুন প্রশ্ন করি। প্ল্যাকার্ড, ব্যানার যে নামেই ডাকি, তাতে যে রক্ত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সে রক্ত কে বা কারা নিয়েছিল? নাকি ঝরিয়েছিল? সেই ইতিহাসটি কি অনুগ্রহ করে সামনে আনবেন কমরেড? সত্য বলার হিম্মত আছে? ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণ হাতে নিয়ে লক্ষ কোটি মানুষ কেন শ্যামাপ্রসাদের মননজাত হিন্দু হোমল্যান্ড পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরায় আশ্রয় নিল, গণধর্ষিতা কন্যা, জননী ভগিনীর লাশ মাড়িয়ে, মৃত, অর্ধমৃত আপনজনকে পথে ফেলে যারা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল, এখনও পালিয়ে আসছে, তারা সবাই কেন হিন্দু? 'অমর একুশের' বাংলাদেশেও পূর্ণিমা শীলরা কেন মর মর হয়ে ৮ শতাংশে পৌঁছে গেছে? অসহায় হিন্দু কিশোরীর মাকে আজও কেন বলতে হচ্ছে, তোমরা এক এক করে যাও, মেয়েটা আমার বড্ড ছোটো? এই প্রশ্নের উত্তর আছে কমরেড? আপনারা কথায় কথায় সেই অর্থনীতির কাঁসর ঘণ্টাটিই বাজিয়ে থাকেন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক কারণেই নাকি এই রক্তপাত, দাঙ্গা! অপেক্ষাকৃত দরিদ্র মুসলমান সম্প্রদায় নাকি হিন্দু জমিদার, জোতদারদের তাড়িয়ে দিয়ে মহান শ্রেণী সংগ্রাম— কোনো কোনো 'সেকুলার' মহামানবের মতে

ভূমিসংস্কার কর্মসূচির রূপায়ণ ঘটিয়েছিল। এমনকী মার্কসবাদী পরিচালক ঋত্বিক ঘটকও তাঁর পার্টিশন ট্রিলজিতে (সুবর্ণরেখা, মেঘে ঢাকা তারা, কোমল গান্ধার) এই 'অর্থনৈতিক কারণের' পরিকল্পিত ধূম্রজাল সৃষ্টি করে নিতা, সীতা, অনসূয়া, ঈশ্বর চক্রবর্তীরা কেন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এদেশে পালিয়ে এলেন, তার প্রকৃত কারণটি মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠার মহান স্বার্থে সজ্ঞানে, সচেতনে এবং পরিকল্পনা মাফিক চেপে গেলেন। কিন্তু ইতিহাস কি চিরকাল চাপা থাকে? অন্তর্জাল মণ্ডিত এই যুগ সন্ধিক্ষণে তা কি সম্ভব? স্ফুলিঙ্গের মতো তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে। বেরিয়ে আসছে চাপা দেওয়া ইতিহাসের কঙ্কাল, ধর্ষিতার পচা গলা লাশ। ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্সিতে পাঠরত একটি ছাত্র (স্বনামধন্য ডাক্তার ব্রজেশ পাকড়াশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক উল্লেখযোগ্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ) পালিয়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সহায়তা করতে গিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে কী কী দৃশ্য দেখেছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির সেই ভয়াবহ স্মৃতিচারণ। সেবা কার্যে যোগ দিয়ে নদীয়া জেলায় তিনি কী কী ভয়ানক দৃশ্যপটের সাক্ষী হয়েছিলেন ইত্যাদি অনেক কিছুই এখন প্রকাশ্য দিবালোকের মতোই পরিষ্কার। আর পাকিস্তানের মন্ত্রীসভায় ঠাঁই নেওয়া দলিত-মুসলমান মিত্রতার প্রতিভূ যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ইস্তফা তো 'ধনী, জমিদার, জোতদার বিতাড়নের' মিথটিকে অনেক আগেই ধূলিসাৎ করেছে। পাকিস্তানের দাবিতে গলা ফাটানো যোগেন মণ্ডল ভেবেছিলেন পিছিয়ে পড়া গরিব, দলিত হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা বেশ মিলে মিশেই থাকবে। যেহেতু উভয়েই দরিদ্র। তাঁর এই ভুলটি ভাঙতে সময় লাগেনি। নিম্নবর্ণের দরিদ্র হিন্দুদের উপর যখন একই রকম মর্মান্তিক অত্যাচার নেমে এল তিনিও বুঝলেন জেহাদিরা অর্থনীতি বোঝে না, মানবিকতাও বোঝে না, উচ্চবর্ণ, নিম্নবর্ণ বোঝে না। হিন্দু মাত্রেই ওদের চোখে কাফের। রাজা, প্রজা নির্বিশেষে। অর্থ থাক বা না থাক অনর্থ ঘটবেই। ব্যানারে যা লেখা নেই, রক্তটা হিন্দুরাই দিয়েছে, আর নিয়েছে জিহাদিরা। যারা তখনও থামেনি, এখনও থেমে নেই। দেশ বিশেষত এই রাজ্য জুড়ে তারা সেই একই কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে চাইছে। সিএএ নামক নতুন নাগরিক আইনটি এই পরিকল্পনাটিতেই জল ঢেলে দিতে পারে এমন আশঙ্কাতেই এই দেশবিরোধী শক্তি সহস্র গুণ সক্রিয় হয়ে উঠেছে। পালিয়ে আসা হিন্দুরা নাগরিকত্ব পেলে যেমন এ রাজ্যের হিন্দুরা আরও সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত হলে সংখ্যালঘুর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। এই বন্দোবস্ত তারা মানবে কেন?

তবে এই কতিপয় বামপন্থী যতই চেষ্টা করুক, ইস্টবেঙ্গল নামক দলটির ব্যানারে যতই লম্ফঝম্প করুক, ওরা কখনই সিংহভাগ হিন্দু শরণার্থীর প্রতিনিধিত্ব করে না। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়াতেই খেলার মাঠে ওদের এই হাস্যকর এবং মরিয়া প্রচেষ্টা।

এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই পালিয়ে আসা বেশ কিছু হিন্দু উদ্বাস্তু এদেশে পা দেওয়া মাত্র রাজনীতির কারবারি হয়ে ওঠেন। গুছিয়ে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় শামিল এই বিশ্বাসঘাতক সেকুলারকুল রক্তাক্ত অতীতটিকে কার্পেটের তলায় পাঠিয়ে দিয়ে বালিতে মুখ গোঁজা উটপাখি হয়ে গেছেন। উদ্বাস্তু থেকে তারা এখন বাস্তুঘুঘু! আর কে না জানে—

''উদ্‌বাস্তু আর বাস্তুঘুঘুর মাঝখানে সীমান্ত নয়, আসলে একটি বাজার আছে; কেজি দরে পূর্বপুরুষের লাশ বিক্রি হয়।''

গোয়েবলীয় প্রচার যেভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছিল, মার্কসবাদী প্রোপাগান্ডারও একই অভিমুখ। কারণ বুদ্ধিমান, মননশীল হিন্দু সমাজ (শ্রীযদুনাথ সরকার যাদের অত্যাচারিত ইহুদিদের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। মেধার কারণে।) দেরিতে হলেও দেশবিরোধী শক্তির পরিকল্পনাটি ধরে ফেলেছেন। আইডেন্টিটি যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁরা ক্রমশ বুঝতে পারছেন। উপলব্ধি করছেন— Kill a man, you will end up killing only an individual ; destroy identity, you will succeed in destroying a nation. একজন মানুষকে হত্যা করলে বড়ো জোর একজন মানুষকেই নির্মূল করা যায়, আইডেন্টিটি ধ্বংস করা মানে সমগ্র জাতিটিকেই বিনাশ করা। ■

শতবর্ষের ইস্টবেঙ্গলে রাজনীতির কালিমা

সঞ্জয় সোম

'রক্ত দিয়ে কেনা মাটি, কাগজ দিয়ে নয়'— কোনো ফুটবল ম্যাচের গ্যালারি থেকে যখন এই ধরনের কথা লেখা একটা বিরাট ব্যানার ঝোলে তখন সাময়িকভাবে একটা চমক তৈরি হয় বই কী। আর ব্যানারটি যখন মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে সল্টলেক স্টেডিয়ামে গত ১৯ জানুয়ারির ডার্বি ম্যাচে, ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকদের গ্যালারি থেকে ঝোলে, এবং সারা রাজ্য জুড়ে কিছু রাজনৈতিক শক্তির মদতে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরোধিতার স্লোগানের অংশকে সুচতুরভাবে তাতে ব্যবহার করা হয়, তখন বিষয়টি আর শুধু ফুটবলে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি আদ্যন্ত একটি রাজনৈতিক বার্তা, যেটি খেলার মঞ্চকে অপব্যবহার করে সারা রাজ্যের টিভি দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পরে একটি বামপন্থী ছাত্রসংগঠন অবশ্য এর দায়িত্ব স্বীকারও করেছেন। প্রশ্ন হলো, হঠাৎ ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারি থেকে কেন, মোহনবাগানের গ্যালারি থেকে কেন নয়?

১৯১১ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে ফুটবল খেলে মোহনবাগানের শুরু আর ১৯২০ সালে শৈলেশ বসু পূর্ববঙ্গের ফুটবলারদের এক করবেন বলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্ম দিয়েছিলেন। দুটি ক্লাবই ফুটবল খেলতো, শরীরচর্চা করতো, বাঙ্গলার বাঁ দিক আর ডান দিক একে অপরের সঙ্গে প্রতিস্পর্ধা করতো ঠিকই কিন্তু একজোট হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে লড়তো। ফুটবলে ঘটি-বাঙাল লড়াই নিজেদের আরও লড়াকু, আরও শক্তিশালী করার কাজে ব্যবহার করা হতো, দেশদ্রোহিতার জন্য নয়। তারপর গঙ্গা ও পদ্মা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে, ইংরেজ চলে গেছে কিন্তু যাবার আগে মুসলিম লিগ আর কংগ্রেসের সঙ্গে দেশভাগের সমঝোতা করে বাঙ্গালিকে ভারতীয় আর পূর্ব পাকিস্তানি করে দিয়ে গেছে। যারা ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করেছিলেন তারা নিজেদের বাপ-ঠাকুরদার বহুত্ববাদী উদার সংস্কৃতি ছেড়ে সংকীর্ণ স্বৈরতান্ত্রিক মরুসংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিলেন। ফলত, প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার চিহ্নমাত্র তারা তাদের নতুন দেশে রাখতে চাননি, বিভিন্ন বাহানায় বারেবারে নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দুদের তারা হয় হত্যা করেছিলেন, নয় জোর করে ধর্মান্তরিত করেছিলেন অথবা পৈতৃক ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। পূর্ববঙ্গে ১৯৪৬-এর অক্টোবর- নভেম্বর জুড়ে নোয়াখালিতে যে হিন্দু নরসংহার শুরু হয়েছিল, তা ১৯৫০, ১৯৬৪ আর ১৯৭১-এ আরও ভয়াবহ রূপ নেয় এবং পৃথিবীর সবচেয়ে কম চর্চিত ধর্মীয় কারণে নরসংহার যদি কোথাও হয়ে থাকে, তো সেটা এই পূর্ববঙ্গে। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল। দেশভাগের পর কমিউনিস্টরা এই বিতাড়িত, সর্বহারা, অসহায় মানুষগুলোর বন্ধু সেজে তাঁদের হাতে লালঝান্ডা ধরিয়ে সর্বনাশ করেছিল। আজ তাদের বংশধরেরা ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারিতে ব্যানার ঝুলিয়ে ঠিক সেই একই কাজ করে চলেছে।

আমি কমিউনিজমকে একটি বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবেই দেখি। পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রণাময় অমানবিক নিপীড়নতন্ত্র তৈরি করে এবং গণহত্যা চালিয়ে যারা বদনাম কামিয়েছেন, সেইসব অমানুষদের কমিউনিস্টরা আইকন বলে গণ্য করেন। আর এই ধ্বংসাত্মক রাজনৈতিক তত্ত্বের যারা অনুসারী, তারা মূলত অসহিষ্ণু, ধর্মদ্বেষী, মানবতাবিরোধী, স্বৈরাচারী, স্বার্থসর্বস্ব, সংকীর্ণমনা এবং দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতায় অবিশ্বাসী। কিছু বললেই এরা হিটলারের কথা তুলে জাতীয়তাবাদ কত বিধ্বংসী, তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন। আসলে এদের গোটা অস্তিত্বই মিথ্যাচারের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। তাই একজন অস্ট্রিয়ানকে এরা অনায়াসে জার্মান জাতীয়তাবাদী বলে দেগে দেন। বস্তুতপক্ষে হিটলার জার্মান ছিলেন না, জাতীয়তাবাদীও ছিলেন না, নিখাদ বর্ণবাদী ছিলেন। তিনি এক কল্পিত আর্যজাতির racial supremacy-তে বিশ্বাস করতেন, সেটি দেশাত্মবোধ নয়। ভারতবর্ষের মতন হিন্দুপ্রধান বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক দেশে আজ স্বৈরতন্ত্রী কমিউনিজমের সত্যিই কোনো স্থান নেই। এদেশের কমিউনিস্টরা এটা বোঝেন বলেই যেন তেন প্রকারেণ নিজেদের সস্তা পাব্লিসিটি করতে চেষ্টা করেন। ফুটবল মাঠে ব্যানার টাঙিয়ে খেলার স্পিরিটকে মাটি করতেও এরা পিছপা নন।

বামেদের দোসর কংগ্রেস ও কংগ্রেসি ঘরানা রাজনীতিবিদদের এবং বামপন্থীদের এত রাগ কেন জানেন? তাদের সমস্ত নীতি বৈষম্যমূলক। সমাজকে ধর্মের নামে, জাতির নামে, লিঙ্গের নামে তারা এতদিন বিভাজিত করে ভোটে জিতে এসেছে। 'ভাগ করো আর রাজ করো', এই নীতিই এত বছর চলে আসছিল। মোদীজী এসে এই নোংরামিটা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন উজালা যোজনায় যারা

গ্যাস পান তাদের কেউ জিজ্ঞেস করেন না তারা সংখ্যালঘু বা তফশিলি জাতি কিনা, গরিব হলেই গ্যাস পাবে। আয়ুষ্মান ভারতেও একই ব্যাপার, স্বচ্ছ ভারত অভিযানে টয়লেট বানানো থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় গৃহহীনদের বাড়ি বানিয়ে দেওয়া, সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রকল্পই এখন বৈষম্যহীন, যাকে ইংরেজিতে বলে non discriminatory। আর একটা কাজ তিনি করেছেন। কোনো ভারতবাসীকে যাতে আর কেউ ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে, তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করেছেন। যে যে সমস্যা এতগুলো বছর ধরে জোর করে জিইয়ে রাখা হয়েছিল, তিনি তার প্রত্যেকটি এক এক করে সমাধান করে দিচ্ছেন। তিন তালাক থেকে ৩৭০ ধারা, রামমন্দির থেকে উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব, যে যে ললিপপ দেখিয়ে এতদিন মানুষকে বিভ্রান্ত করে ভোট হাতানো যেত, সব এক এক করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাদের সর্বনাশ হচ্ছে তাদের ভয়ংকর রাগ হওয়াটাই স্বাভাবিক। সেটাই আছড়ে পড়েছে ট্রেনের ওপর, স্টেশনের ওপর, দমকলের ওপর, বাসের ওপর, দোকানপাটের ওপর আর

পুলিশের মাথার ওপর। যাদের দিয়ে এই গুন্ডামি করানো হচ্ছে তারা নির্বোধ। তারা এখনো এই বিভাজনকামী নষ্ট রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর আস্থাশীল। এটাকেই বোধহয় Stockholm syndrome বলে।

সুখের কথা হলো, দেশের অধিকাংশ মানুষ মোদীজীর সঙ্গে আছেন। তাঁর সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ জনসমর্থন পাচ্ছে। যতবার সংবাদমাধ্যম সার্ভে করছে, ততবার এটাই বারেবারে উঠে আসছে।

ইদানীং কিছু অভিনেতা-অভিনেত্রী একটি 'কাগজ দেখাবো না' পালায় চুটিয়ে অভিনয় করছেন, অবশ্যই ওই ব্যানারের শেষ অংশটি তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত। যারা বলছেন কাগজ দেখাবেন না, না দেখানোটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার বটে। কিন্তু গোটাকয়েক প্রশ্ন থেকে যায়। স্কুলে ভর্তি করতে গেলে বার্থ সার্টিফিকেট দেখান কেন? ট্র্যাফিক পুলিশ ধরলে ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখান কেন? চাকরির সময় শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট দেখান কেন? ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে আইডেন্টিটি আর রেসিডেন্স প্রুফ দেখান কেন? ভোট দিতে গেলে ভোটার পরিচয়পত্র দেখান কেন? বিদেশ যেতে গেলে ভিসা লাগানো পাসপোর্ট দেখান কেন? শ্মশানে ডেথ সার্টিফিকেট দেখান কেন? কারণ এসব দেখানো নিয়ম।

যারা 'কাগজ দেখাবো না' নামক ভিডিয়োটির স্পনসর, তারা আসলে হিন্দুদের সর্বনাশ করতে চায়। এরা নিজেরা চিরকাল মুখে সর্বহারার কথা বলে বেড়ায় অথচ নিজেদের ছেলে-মেয়েদের নামি দামি স্কুলে পড়ায়, উচ্চমানের জীবনযাত্রা ভোগ করে আর মানুষকে খেপিয়ে দিয়ে সপরিবারে বিদেশে ছুটি কাটাতে চলে যায়। এদের বিশ্বাস করে ক্ষমতায় এনে আজ পশ্চিমবঙ্গের কলকারখানা সব বন্ধ হয়ে গিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েগুলোর চাকরি নেই। এদের বিশ্বাস করে পশ্চিমবঙ্গের চাষজমি খণ্ডিত হতে হতে এত ছোটো ছোটো হয়ে গেছে যে তার থেকে আর কৃষকের পেটভরার মতন আয় হয় না। এরা চিরকাল গরিবের সর্বনাশ করে নিজেরা নির্লজ্জের মতন বড়োলোকি করেছে, এখনো তাই করছে। এদের কথা শুনে আবার নতুন করে ঠকবেন না। যখন কাগজ দেখবার সময় আসবে, গর্বের সঙ্গে দেখাবেন। আপনি-আমি ভারতের নাগরিক, এটা তো গর্বের কথা। তার প্রমাণ চাইলে দেব না? কেন দেব না? একশোবার দেব, হাজারবার দেব। বিদেশিরা দিতে পারবে না, সেটা তাদের সমস্যা, আমার নয়। এই প্রচুর টাকার পাহাড়ের উপর বসে থাকা অত্যন্ত ক্ষমতাবান বাবু-বিবিরা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশিদের বাঁচাতে আমাদের গরিব অক্ষম আত্মজনের সর্বনাশ করতে চাইছেন। সুখের কথা এই যে, দেশের মানুষ ওদের খেলা ধরে ফেলতে শুরু করেছেন।

আজ এই গোটা নাগরিকপঞ্জী বিরোধী ইকোসিস্টেম বা ব্যবস্থাতন্ত্রটিকে আয়না দেখানোর সময় এসেছে। বাংলাদেশের মাটির জন্য, বাংলাভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে ওখানকার অসংখ্য হিন্দু বাঙ্গালি আর ভারতের সৈন্যবাহিনী, যার এক কণা দামও বাংলাদেশের মুসলমানরা দেননি। নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত সেই উদ্বাস্তুদের এত বছর কোনো সরকার নাগরিকত্ব দেয়নি, এইবার নরেন্দ্র মোদী সরকার দিয়েছে। কেন বাংলাদেশি মুসলমানদেরও সেই সঙ্গে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না সেই প্রশ্ন তুলে এতদিন সংখ্যালঘুর ভোটব্যাঙ্ক ভাঙিয়ে তোষণের রাজনীতি করা দলগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে রাস্তায় নেমেছে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকদের উচিত এদের মাত্র দুটো প্রশ্ন করা :

১. পূর্ববঙ্গ থেকে শরণার্থী হয়ে আসা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তো পয়সার জোরে অথবা প্রভাব খাটিয়ে এতদিনে নিজেদের নাগরিকত্ব জোগাড় করে নিয়েছেন, পড়ে আছেন গরিব নিম্নবিত্ত অবহেলিত হিন্দুরা। তাঁদের নাগরিকত্বের বিরোধিতা করতে লজ্জা করে না?

২. যে ২৩ শতাংশ মুসলমান নিজেদের জন্য দেশের ২৮ শতাংশ জমি ভাগ করে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, তারা তো দেশভাগের আগে অখণ্ড ভারতেরই নাগরিক ছিলেন। এখন যদি তারা আবার ভারতের নাগরিক হতে চান, তাহলে দেশের বিভাজন ঘুচিয়ে দিয়ে আবার ভারতে বিলীন হয়ে গেলেই তো হয়। সেটা কেন চাওয়া হচ্ছে না? ▮

গোলাভরা ধান কাদের জন্য ফেলে এলেন কমরেড?

দেবতনু ভট্টাচার্য

কলকাতার ডার্বি চলছে। 'রক্ত দিয়ে কেনা মাটি, কাগজ দিয়ে নয়' লেখা একটি ব্যানার শোভা পাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল গ্যালারির মাথায়। ম্যাচ শেষ হতে না হতেই নেট দুনিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন। কে জিতলো, কে হারলো সেটা হয়ে গেল গৌণ। বাঙ্গালির ফুটবলের আবেগ রূপ নিল রাজনীতির তরজায়।

এই ব্যানারটা লাগিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল আল্ট্রাস নামের একটি গ্রুপ। এরা মূলত বামপন্থীদের একটা গোষ্ঠী। যদিও বামপন্থীরা বর্তমানে লুপ্তপ্রায়, তবে যে ক'জন টিকে আছে তারা কুমিরের ছানার মতো সময় ও সুযোগ বুঝে বিভিন্ন মঞ্চে হাজির হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। কারণ তাদের 'দীর্ঘজীবী বিপ্লব' এখন সাত পার্সেন্টে এসে ঠেকেছে। আর সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রণয়নের পরে তারা এখন একেবারে চোরাবালির উপর দণ্ডায়মান। এই সাত পার্সেন্ট কমতে কমতে ২০২১-এ যে দুই পার্সেন্টেও টিকবে না— এটা তারা ভালোভাবেই বুঝতে পারছে। তাই এখন যে কোনো ভাবে ভেসে থাকতে হবে, খবরে থাকতে হবে, চর্চায় থাকতে হবে। তাই কিছুটা অক্সিজেন পাওয়ার আশায় ডার্বির মাঠে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী ব্যানার টাঙানো।

আমাদের ছোটোবেলায় পাড়ার কিনুকাকা আমাদের জোকস্ শোনাতেন। আমরাও আগ্রহ সহকারে সেগুলো রীতিমতো গিলতাম। একদিন কিনুকাকা শুরু করলেন; বুঝলি, একবার একটা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে কলকাতায়। বিষয় হলো কার টেকনোলজি কত উন্নত। জাপানের বৈজ্ঞানিকরা এমন একটা সুঁচ তৈরি করে ফেললো যে সেটা খালি চোখে দেখাই যায় না। তখন আমেরিকার বৈজ্ঞানিকরা এগিয়ে এলো। সবাইকে আশ্চর্য করে দিয়ে তারা সেই সুঁচের মধ্যে একটা ফুটো করে দিল। ব্যাস্। পৃথিবীর সব দেশের বৈজানিকরা হাত তুলে দিল। সেরা পুরস্কার আমেরিকার সেই বৈজ্ঞানিকের হাতে তুলে দেওয়া হবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের ১০ নং ওয়ার্ডের সর্বহারার নেতা কমরেড বিভাসদা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে একেবারে মঞ্চের উপরে এসে হাজির। দাদা একটা চান্স দেবেন আমায়? না হলে কিন্তু ইউনিয়নের লোক ডেকে সব ভণ্ডুল করে দোবো বলে দিলাম। অগত্যা, সেই সুঁচ তুলে দেওয়া হলো কমরেড বিভাসের হাতে। কারণ রাজ্যে তখন মানুষের শরীরের রক্ত বাদে সবকিছুই লাল। কমরেড তখন পকেট থেকে বিড়ির প্যাকেটটা বের করে তার মধ্যে সুঁচটা ঢুকিয়ে দিল আর সেই প্যাকেটের উপরে লিখে দিল 'Made in China'। তারপর হাত মুঠো করে আকাশে ঘুষি মেরে বললো 'চীনের চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়াম্যান! এটাই বাম-বামাতিদের সংস্কৃতি। অন্যের প্রডাক্টে নিজেদের ট্রেডমার্ক লাগিয়ে বেচে দেওয়াটাই তাদের বিপ্লবের কঠিন পথ। আপনি দুর্গাপূজা করুন, এরা সেই আসরে নিজেদের 'ধর্ম মানে আফিম' শীর্ষক বই বেচতে চলে আসবে। আপনি পাড়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করুন, সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার দুজন কমরেডকে মঞ্চে তুলে 'ওরা জীবনের গান গাইতে দেয় না' অথবা 'হেনরির হাতুড়ি' গাইয়ে আপনার মঞ্চটাকেই ওদের বিপ্লবী মঞ্চে পরিণত করার চেষ্টা করবে। একই ভাবে ডার্বির মাঠে ওদের প্রথম লক্ষ্য ছিল মিডিয়া অ্যাটেনশন, আর দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল নিজেদের মতামতটাকে গোটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মতামত বলে চালিয়ে দেওয়া, যেন গোটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সভ্যসমর্থক তথা বৃহত্তর ইস্টবেঙ্গল সমাজ (ওপার বাংলা থেকে আসা উদ্বাস্তু সমাজ)-এর প্রতিনিধিত্ব ওরাই করছে। এটা

ছিল গোটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের উপরে 'সিএএ বিরোধী' তকমা লাগিয়ে দেওয়ার একটা অপচেষ্টা।

এতো গেল বাম-বামাতিদের দুর্বুদ্ধির কথা। এবার আসি রক্ত দিয়ে মাটি কেনার বিষয়ে। বলুন তো এপারে এসে মাটি কিনতে কতজনকে ক'ফোঁটা রক্ত দিতে হয়েছে। উদ্বাস্তুদের এপারে থাকার জন্য কার সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছে? যদি কেউ এই উদ্বাস্তুদের রক্ত ঝরিয়ে থাকে, তারা হলো এই বামপন্থীরাই। মরিচঝাঁপির ইতিহাস নিশ্চয়ই আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না! আজকে তারাই বলছে রক্ত দিয়ে কেনা মাটি! তাই এই রক্ত দিয়ে মাটি কেনার দাবি বাম-বামাতিদের মুখে শোভা পায় না। আর যদি পরিশ্রম ও কষ্টকে রক্তমূল্য ধরা হয় তাহলে এই কষ্টের কারণ কী? এই পরিশ্রম কেন? কেন গোলাভরা ধান আর পুকুর ভরা মাছ ওপারে ফেলে এপারে আসতে হলো? কারা সেগুলো কেড়ে নিয়েছিল? কারা তাদের বাড়িতে আগুন দিয়েছিল? কারা তাদের বাপ-ঠাকুরদাকে খুন করেছিল? কারা তাদের পরিবারের মহিলাদের ধর্ষণ করেছিল? কারা তাদের রক্ত ঝরিয়েছিল? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কি তাদের অজানা? যারা আজ বড়ো গলায় বলছে রক্ত দিয়ে কেনা মাটি তাদের বলতে চাই, রক্ত দিয়ে মাটি তোমরা কেনোনি ভাই, আমাদের রক্ত সিঞ্চিত মাটি মুসলমান জেহাদিরা তোমাদেরই উস্কানিতে কেড়ে নিয়েছে। আজ একথা স্বীকার করার মতো সাহসও নেই। মাস্টারদা সূর্যসেন, লোকনাথ বল, প্রীতিলতাদের রক্তসিঞ্চিত সেই জালালাবাদের মাটির অধিকার দাবি করার সৎসাহস আছে তোমাদের? বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তোমাদের পূর্বপুরুষ যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন, তাদের রক্তস্নাত মাটির অধিকার দাবি করার সৎসাহস আছে ভাই? তাঁদের রক্তের মূল্য কি তোমরা কোনও দিন দিয়েছো বা ভবিষ্যতেও কোনও দিন দিতে পারবে? তাই রক্তদানের কথা আজ তোমাদের মুখে শোভা পায় না। তোমরা আগাপাশতলা ভণ্ড।

রইলো কাগজের কথা। আজও ঠাকুরদার পুরোনো টিনের বাক্সটা হাতিয়ে দেখো। যশোর কিংবা ময়মনসিংহে ফেলে আসা ভিটের কাগজটা সযত্নে রাখা আছে হয়তো। আজও আশা আছে, যদি কোনোদিন এই কাগজের মূল্য পাওয়া যায়। আমি শুনেছি একটা রিফিউজি সার্টিফিকেটের জন্য হন্যে হয়ে সরকারি অফিসের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোর ইতিহাস। আমি দেখেছি এনিমি প্রোপার্টির কাগজ নিয়ে সরকারি অফিসের সামনে লম্বা লাইন দিয়ে মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে। যদি এই কাগজের বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু অর্থমূল্য পাওয়া যায়। ওপার থেকে এপারে এসে একটা জাল রেশন কার্ড, একটা জাল ভোটার কার্ড, নিদেনপক্ষে একটা ভুয়ো স্কুল সার্টিফিকেটের জন্য কী পরিমাণ ছোটাছুটি, মনে নেই? সেগুলোও তো নিছক কাগজই, তাই নয় কি? সুতরাং ওপার থেকে এপারে আসার পর আজ তোমরা যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছো, তোমাদের পূর্বসূরীদের মেধা এবং পরিশ্রমকে সম্মান করেই বলছি, তার বেশিরভাগটাই কাগজের মূল্যে, রক্তের মূল্যে নয়।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন জাতীয়তাবাদী শক্তি (Making India Force) এবং জাতীয়তাবিরোধী শক্তি (Breaking India Force) —এই দুটি শিবিরে ভাগ করে দিয়েছে। আজ সময় এসেছে, আমাদের সঠিক পক্ষ বেছে নেওয়ার। বন্ধ্যা নারীর যেমন গর্ভযন্ত্রণার বিবরণ দেওয়া বাতুলতা মাত্র, ঠিক সেইভাবেই সেকুলার বাঙ্গালদের মুখ দিয়ে 'রক্তের মূল্য' সম্পর্কে বেশি কিছু প্রকাশিত না হওয়াই ভালো। যারা বৈধ নাগরিকত্বের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে এবং জাল কাগজের ভিত্তিতে বেঁচে থাকাকে সম্মানজনক মনে করে, তাদের কাছে রক্তের মূল্য সম্পর্কে শিক্ষা নিতে হবে? এরা আসলে 'টুকরে টুকরে গ্যাং'-য়ের স্লিপার সেল। এদের চিহ্নিত করতে হবে এবং এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশেষে বলতে চাই, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে দু'হাত তুলে স্বাগত জানান এবং নিশ্চিতভাবে জানুন, এই আইনই বাস্তবে ছিন্নমূল ভারতপ্রেমীদের রক্তের মূল্য এবং মর্যাদা দিয়েছে।

—(লেখক হিন্দু সংহতির সভাপতি)

একটাই Bank Account-এর মাধ্যমে
সারা জীবনের মত সমাধান

Smart Online Account খুলুন, নিজেকে এগিয়ে নিয়ে চলুন

আজই খুলুন আপনার ICICI Bank এর
3 in 1 Account
(TRADING, DEMAT & SAVINGS)

- Online Savings Bank A/C পরিষেবা।
- Trading A/C & Demat A/C
- Online Equity, Mutual Fund, PPF, Bond, FD ইত্যাদি সমস্তরকম Financial Product কেনা-বেচা বাড়িতে বসেই করতে পারবেন।
- বার বার Form Fillup করার বা Signature করার প্রয়োজন নেই।
- Maturity-র সময় Signature না মেলার (Missmatch) কোন ঝঞ্ঝাট নেই।
- এককথায় ইনভেস্টমেন্ট এখন আপনার হাতে মুঠোয়। আর Bank আপনার পকেটে।

ICICI Securities
Nurturing Profitable Partnerships

DRS INVESTMENT
Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond
Find us on Facebook
Contact : 98303 72090 / 97489 78406
E-mail : drsinvestment@gmail.com

ভারতে ট্রেনিং দিতে চান ব্লেক

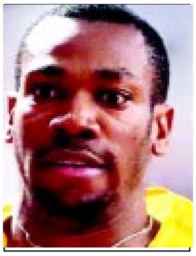

জামাইকার ইয়োহান ব্লেক এত বছর দুনিয়ার দ্রুততম মানব উসেইন বোল্টের ছায়ায় ঢাকা পড়েছিলেন। বোল্ট সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। আর ব্লেক তার নিজস্ব ছন্দ ও মাত্রা নিয়ে এখনো দেশে-দেশে ট্রাকে ঝড় তুলে চলেছেন। এখনো কয়েক বছর বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সে নিজের ছায়াকে প্রলম্বিত করে রাখার ক্ষমতা ধরেন ব্লেক। সম্প্রতি মুম্বাই এসেছিলেন পথ নিরাপত্তা সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে। তার অবকাশে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন দেশের সব গণমাধ্যমকে সাংবাদিক সম্মেলনে।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

□ ভারতে ট্রেনিং দিতে কতটা আগ্রহী?

● **ব্লেক :** ভারত আমার অত্যন্ত প্রিয় একটি দেশ। সম্প্রতি মুম্বাই এসে দেখলাম এখানকার মানুষ কতটা আন্তরিক ও সহৃদয়। বিদেশি অতিথিকে যথাযথ সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। আর বিশ্বমানের অ্যাথলিটকে একটু বেশিই করেন। মুম্বাইতে যে-ক'দিন ছিলাম একাধিক অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। বিশিষ্ট নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এদেশে অ্যাথলেটিক্সের যথেষ্ট প্রতিভা আছে। ঠিকমতো পরিষেবা দেওয়া ও পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধে পেলে ভারতীয় অ্যাথলিটরা বিশ্বপর্যায়ে সাফল্য পেতে পারে। আমি খবর নিয়ে দেখেছি গত জাকার্তা এশিয়াডে ভারত অ্যাথলেটিক্সে ৮টি সেনা-সহ ২০টি পদক পেয়েছিল। কিন্তু পরের বছর দোহায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে কোনো পদক জিততে পারেনি ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স। এই ফারাকটা কমিয়ে আনতে চাই। আমি জামাইকা থেকে উঠে এসেছি। সেখানে আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভারতের মতোই কিন্তু অ্যাথলেটিক্সকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পদকজয়ী অ্যাথলিটদের রাজার সম্মান দেওয়া হয়। আধুনিক পরিকাঠামো ও উন্নত ট্রেনিং দিয়ে একেবারে অল্প বয়স থেকেই তাদের তৈরি করা হয়। ঠিক সেরকম একটি অ্যাকাডেমি গড়তে চাই ভারতে।

□ আসন্ন অলিম্পিয়াড নিয়ে কী ভাবছেন?

● **ব্লেক :** বিশ্বপর্যায়ের সব প্রতিযোগিতায় সোনা জেতা হয়ে গেছে। শুধু অলিম্পিকে সোনাটাই এখনো অধরা। উসেইন বোল্ট যতদিন ট্রাকে ছিলেন অন্য কেউ অলিম্পিক সোনায় ভাগ বসাতে পারেননি। বোল্ট সর্বকালের সেরা স্প্রিন্টার, সুপারম্যান। আমার বয়স এখন ৩৪। এই অলিম্পিকই আমার শেষ মিট। সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাবো। দোহায় যখন সোনা পেয়েছি তাই মনে হয় টোকিয়োর ট্রাকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। আসাফা পাওয়েল, জাস্টিন গ্যাটলিনরাও বিশ্বসেরা স্পিন্টার বহু কীর্তির অধিকারী। এছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, গ্রেট ব্রিটেন থেকে বেশ কিছু অসাধারণ স্প্রিন্টার উঠে এসেছে দোহার বিশ্বমিটে। তারাও শক্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। তবে আমি বিশেষ ধরনের ট্রেনিং নিচ্ছি জামাইকায়। অলিম্পিকের আগে ইউরোপে বেশ কয়েকটি ডায়মন্ড লিগে অংশ নেব। দেখলেই বোঝা যাবে বর্তমান সময়ে কে কেমন ফর্মে আছে। আমার সাপোর্ট স্টাফ, প্রেমিকা লরা পিয়ার্সন সব সময় আমাকে মনস্তাত্ত্বিক ভাবে যথেষ্ট তরতাজা রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনিং পদ্ধতিতেও কিছু বদল এনেছি। মনে হয় এই ধরনের ট্রেনিং ও আত্মপ্রত্যয়ীভাব আমাকে পোডিয়ামের শীর্ষে তুলে ধরবে।

□ গত এক দশকে অ্যাথলেটিক্সে কী কী পরিবর্তন হয়েছে?

● **ব্লেক :** প্রযুক্তির ব্যবহার অনেক বেড়ে গেছে। আধুনিক প্রযুক্তি, সরঞ্জাম বর্তমান যুগের অ্যাথলিটদের অতি মানবিক সত্তায় উন্নীত করেছে। তবে প্রকৃতিগত ক্ষমতা ও দক্ষতার বিচারে আগের যুগের অ্যাথলিটরা অনেক বড়ো মাপের ছিলেন। আর এখন অবৈধ পদ্ধতি অবলম্বন বেড়ে গেছে। এমনভাবে ডোপিং করছেন ধরা পড়ছেন না। সিস্টেমের মধ্যে দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে। প্রচুর অর্থের হাতছানি উপেক্ষা করা দুঃসাধ্য। আগে এত স্পনসরশিপ, এনডোর্সমেন্ট ছিল না। ট্রাকের মধ্যে সেরা হলে যেমন আছে প্রচুর অর্থের পুরস্কার তেমনি বিজ্ঞাপনের বাজারেও হাইপ্রোফাইল কমোডিটি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হয়। তাই এ যুগে ল্যাবরেটোরিতে বিজ্ঞানভিত্তিক অনুশীলনের পাশাপাশি চলে সূক্ষ্ম পদ্ধতিগত ডোপিং যা অনেক সময় ধরা সম্ভব নয়।

□ বোল্টের সান্নিধ্যে কতটা উপকৃত হয়েছেন?

● **ব্লেক :** বোল্ট শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিটই নন, অসাধারণ মানসিকতা সম্পন্ন এক পুরুষ, যে সবসময় ইতিবাচক থাকে অন্যের মধ্যেও ইতিবাচক তরঙ্গ সঞ্চারিত করে। ট্রাকে ওর সঙ্গে বছরের পর বছর প্র্যাকটিস করে যেমন উপকৃত হয়েছি তেমনি গত একদশক বিশ্বজুড়ে বহু প্রতিযোগিতায় একসঙ্গে রুম শেয়ার করে মানসিক ভাবেও নিজেকে অন্য মানুষ ভাবতে শিখেছি। যে মানুষ সবসময় ট্রাকে নামে অদম্য জেদ আর সংকল্প নিয়ে দেশের পতাকাকে আরও উঁচুতে তুলে ধরার দায়বদ্ধতা নিয়ে। বোল্ট শিখিয়েছেন অ্যাথলেটিক্স হলো জীবন ও সমাজের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী এক মাধ্যম। একটা সম্পূর্ণ মানুষ ও সমাজ গড়ে ওঠে অ্যাথলেটিক্সের ট্রাকে। সেই দর্শন নিয়ে আজও ট্রাকে নামি আর সেখানে যাই সেখানকার মানুষের মধ্যে এই বোধ ছড়িয়ে দিই। জামাইকা ও ভারতে ভবিষ্যতে যদি বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে কাজ করি তাহলে এই ভাবনাকে আরও বিধৃত করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দেব। যে সমাজ যে দেশ অ্যাথলেটিক্সে উন্নত সেই দেশের জীবনচর্যার মানও বিশেষ মাত্রায় উচ্চকিত। ■

বিশ্বজোড়া ছিল বাঙ্গলার মসলিনের বাজার

চূড়ামণি হাটি

বঙ্গভূমি থেকে মসলিন রপ্তানি হতো ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে জঙ্গলবেড়ি বাণিজ্য কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে। একই সঙ্গে ব্যবহৃত হতো অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষ্ণা জেলায় বঙ্গোপসাগরের কুলে মসলিপত্তম বন্দরটি। ইরাকের মসুল বন্দর এবং ফিলিপাইন-সহ পূর্ব এশিয়া জুড়ে ছিল মসলিনের বৃহৎ বাজার। পর্তুগিজদের হাত ধরেই মূলত বিদেশে গেছে বাঙ্গলার মসলিন। বাঙ্গলার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত মাটির যক্ষিণী ফলকগুলির খোদাই কাজে মসলিন শাড়ি পরার ইঙ্গিত স্পষ্ট। ফুটি কার্পাস সুতোয় প্রস্তুত হয় আটশো বা তারও বেশি কাউন্টের সূক্ষ্ম বস্ত্র মসলিন। চাষিরা ফুটি কার্পাসের বীজ তেল ও ঘি-তে ভিজিয়ে মাটির পাত্রে রেখে দিত। মাটির পাত্রটি উনুনের কাছাকাছি শিকের ভেতর ঝুলিয়ে রাখতো। বসন্তকালে এই কার্পাস চাষ হয়। ফুটি কার্পাসের বীজ ও তুলো কাছাকাছি থাকে। লম্বা-সূক্ষ্ম-নরম এই আঁশ বীজ থেকে সতর্কতার সঙ্গে খসিয়ে নেওয়ার জন্য বোয়াল মাছের চোয়ালের দাঁত চিরুণীর মতো ব্যবহার করা হতো। চিতল ও কুঁচ মাছের চামড়ায় এই আঁশ-তুলো বিছিয়ে রেখে রেশম-সুতোর ধনুনিতে ধুনে নেওয়া হতো। এরপর টাকু চরকায় সুতো কাটা এবং মাঝে মাঝে পাথরের বাটিতে রাখা খড়িমাটি হাতে মেখে নেওয়া। নলি বা বল্লম আকৃতির মাকুতে তাঁত বোনা হয় এবং মাকু পিচ্ছিল রাখতে ব্যবহার করা হয় সরষের তেল। মসলিনের টানায় সুতোর নরম ভাব টিকিয়ে রাখতে ব্যবহার করা হয় খইয়ের মাড়। নদীর তীর থেকে ভেসে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া এই শিল্পের উপযোগী। চোখের তীক্ষ্ণ জ্যোতি ও আঙুলের নিপুণ তৎপরতায় অল্প বয়সি মেয়েরা সুতো তৈরির কাজটি করতো ভোরের ঠাণ্ডা পরিবেশে। মসলিনের সুতো গোল না হয়ে একটু চ্যাপ্টা হতো। এক পাউন্ড সুতো একশো পনেরো নয়; দু' শো' পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত দীর্ঘ হতো। মসলিন বোনার জন্য বর্ষাকালই শ্রেষ্ঠ। গ্রীষ্মে তাঁতের নীচে জলভর্তি পাত্র রাখা হতো।

মিহি ও সূক্ষ্মতার তারতম্যে মসলিনের নানা ভাগ। বাঙ্গলার নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কড়া নজরদারিতে প্রস্তুত হতো উন্নত মানের সুতোর বুননে 'মলবুশ খাস'। নবাবদের অপছন্দ সত্ত্বেও মোগল পরিবারের অন্দরে 'ঝুনা' মসলিনের চল ছিল। কথিত আছে সাতপর্দা মসলিনে শরীর ঢেকেও জেব-উন্নিসা পিতা ঔরঙ্গজেবের নজরে এসে তিরস্কৃত হয়েছিলেন। নর্তকীরা ব্যবহার করতো লজ্জা নিবারণে একেবারেই অসমর্থ 'মলমল খাস' বা 'মুলবুই খাস'। ঘাসে 'শবনম' বিছিয়ে দিলে ঘাসের সঙ্গেই মিলিয়ে যেতো। 'শবনম'-এর অর্থ হলো ভোরের শিশির। 'আর-ই-রোয়ান নদীর স্রোতে মেলে ধরলে অদৃশ্য হয়ে যেতো। যেন প্রবাহিত জল। ঘূর্ণি হাওয়ায় নিখোঁজ যেতো 'বাফতা'। যার অর্থ বাচ্চা হাওয়া। 'আইন-ই-আকবরী'-তে সূক্ষ্ম ঠাস বোনা 'খাসসা'-র উল্লেখ আছে। 'সার-বন্ধ' মসলিন দিয়ে তৈরি হতো সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মীদের পাগড়ি। কথিত আছে, পারস্য সম্রাট চ্যাসোফি-কে সন্তুষ্ট করতে নারকেল খোলের ভেতর পাঠানো হয়েছিল ষাট হাত দীর্ঘ মণি-মুক্তো দিয়ে সাজানো মসলিন কাপড়ের পাগড়ি। সে যেন মাকড়সার জাল। আসলে মসলিন এতোই সূক্ষ্ম যে কুমিদার সম্প্রদায় নাকি মসলিন ভাঁজ করে দেশলাই বাক্সেও রেখে দিতেন। নবম শতাব্দীতে আবরবীয় পর্যটক সুলেমান মসলিন প্রসঙ্গে বলেছেন, একটি প্রমাণ সাইজের সম্পূর্ণ মসলিন কাপড় আংটির মধ্য দিয়ে গলে যায়। 'নয়ন সুখ', 'তানজের', 'জঙ্গল-ই-খাস', 'বদন খাস', 'সরকার-

ই-আলি’, ‘চন্দ্রবনী’, ‘মাসরু’ এই ধরনের নানা নামের মসলিন ছিল যেন এক এক গুণে শ্রেষ্ঠ। বলাবাহুল্য, এক সময় জামদানিকে বলা হতো পুষ্পিত মসলিন বা বুটি তোলা মসলিন। ‘কাসিদা’ মসলিনের নিকৃষ্ট সংস্করণ। গভর্নমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল মিউজিয়াম এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মসলিন শাড়ির গায়ের অলংকরণ বলতে তিন-চার পাপড়ির ফুল কিংবা জ্যামিতিক নকশার স্রোত। শুভ্র বর্ণই ছিল প্রধান লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, কালো রং করার প্রথাও ছিল। সূক্ষ্মতা ও হালকা অনুভব প্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি হয়েছিল অসংখ্য ভাঁজে নানা ধরনের পোশাক। মোগলরা আসার আগে পরিধেয় বস্ত্র ছিল সেলাই বিহীন।

চুন আছে এমন জল মাটির গামলায় নিয়ে গরম করা হতো মসলিন কাচার জন্য। প্রয়োজনে কলাগাছের শুষ্ক খোল পুড়িয়ে অল্প জলের মিশ্রণে তৈরি বাসাম কিংবা সাজি মাটি, সোডা, লেবু এগুলি কাচার জন্য জলে মেশানো হতো। দাগ তুলতে ব্যবহৃত হতো আমরুল পাতার রস। কাচতে গিয়ে সুতোর স্থানচ্যুতি ঘটলে, তা ঠিক করতে অতি যত্নে ও ধৈর্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হতো নাগফণি গাছের কাঁটা। মুসলমান রিফুকরেরা আফিমের নেশা চড়িয়ে মাতালের মতো রিফুকাজ করতেন। শঙ্খ দিয়ে ঘসে মসলিন মসৃণ করা হতো। এভাবেই মসলিনের লালিত্য গুণের পুনঃ প্রকাশের চেষ্টা চলতো। বিলাসিতার এই অন্যরূপ মোঘল আমলেই বিকশিত হয়েছিল। আকৃষ্ট হয়েছিল পর্তুগিজ ও ইংরেজরা। বলাবাহুল্য, পর্তুগিজরা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে হুগলিতে মসলিনের উপর তসর সিল্কের কাজ করিয়েছিল। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে মসলিন সম্পর্কে ইংল্যান্ডের রানি মেরির কৌতূহল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল বাঙ্গলার মসলিন। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার তেজ গাঁয়ে মসলিনের আকর্ষণে ইংরেজরা কুঠী স্থাপন করে। আকবরের সভাসদ আবুল ফজল এবং ইংরেজ পর্যটক র‍্যাফল ফিচ্ সোনার গাঁওয়ের মসলিনের প্রশংসা করেছেন। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ যখন ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন, তখন একদল দক্ষ তাঁতশিল্পী চলে এসেছিলেন মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের অদূরে ভাগীরথীর কূলে। সেকেলে নাম ছিল বালুচর। এক সময় এই শিল্প-গ্রাম অতল জলে তলিয়ে যায়। আর শিল্পীদের কেউ কেউ বীরপুর ও মীরপুরে থেকে যান এবং কিছু চলে যান বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর কিংবা সুদূর বেনারস।

পশ্চিমবঙ্গে জিয়াগঞ্জ ও বিষ্ণুপুর ছাড়াও মসলিন তৈরির সুনাম অর্জনের চেষ্টায় আছে বর্ধমানের সমুদ্রগড়, কালনা ও কেতুগ্রাম। অষ্টাদশ শতকে বিশ্ববাজারে বাঙ্গলার তাঁতের যে অহংকার ছিল তা ধাক্কা খায় ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ‘প্রাইভেট ট্রের্ডাস’দের মসলিন বস্ত্র উৎপাদন ও ব্যবসার উপর নিয়ন্ত্রণ এনে দিল। কথিত আছে ব্রিটিশ কোম্পানি ও গোমস্তাদের শোষণ এমন মাত্রা নিয়েছিল যে, কেউ কেউ নিজের আঙুল কেটে ফেলতে বাধ্য হয়েছিল। ততদিনে বাঙ্গলার বেশ কয়েক প্রকার কাপড়ের বিদেশ পাড়ি দেওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। নিজস্ব সম্পদ ও হস্তচালিত প্রযুক্তি নিয়ে গড়ে ওঠা বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের পেছনে যন্ত্র-প্রযুক্তি বিদ্যা নয়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিজ দেশের বস্ত্র শিল্পের গতি সচল রাখার চেষ্টাই ছিল মূল কারণ।

সেদিন পরাধীন ভারতের বেশ কিছু বস্ত্র শিল্পের শিল্পী সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল সাধারণ জীবিকায়। ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ায় কাঁচামাল চলে যায় বিদেশে। পরাধীন ভারতের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল বিদেশের বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করা। এরূপ নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তৈরি হওয়া সুলভ শ্রমকেও বিদেশিরা কাজে লাগিয়েছে। বর্তমানে স্বাধীন ভারতে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাংস্কৃতিক পরাধীনতা। পাশাপাশি যখন যন্ত্রনির্ভর বৈচিত্র্যহীন উৎপাদনের বাড়বাড়ন্ত তখন ঐতিহ্য নির্ভর জ্ঞানভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হস্তচালিত তাঁত বয়নশিল্পের ধরাকে ধরে রাখাটা শিল্পীদের কাছে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লড়াই। এজন্য অবহেলিত শ্রম শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববাজার ও অভ্যন্তরীণ বাজারে দক্ষতার মূল্যকে ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্রান্ড হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বাঙ্গলার বাজারে ম্যানচেস্টার এবং ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ল্যাঙ্কাশায়েরের মিলের কাপড় এসে গেলেও বিশ্বজুড়ে তখন মসলিনের সুনাম অব্যাহত ছিল। যন্ত্রযুগে আরও অনেক কাপড় আসার পরও মসলিনের সুনাম থমকে যায়নি। জোড় করে মসলিন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। নিজস্ব সংস্কৃতির রঙের প্রকাশ ঘটাতে পারলেই বস্ত্রশিল্প ফিরে পাবে হারানো গৌরব। ভেতরের বাঁধন শক্ত করতে হবে দেশাত্মবোধের আবেগকে ছড়িয়ে দিয়ে। তখনই সূক্ষ্ম বস্ত্রের পাশাপাশি মোটা কাপড়ও ফিরে পাবে তার গৌরব। ■

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ রাজা দশরথের

অমিত ঘোষ দস্তিদার

শুরু হলো পুত্রেষ্টি যজ্ঞ। অগ্নির দৃষ্টি নন্দন রূপ লেলিহান শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। অগ্নি যজ্ঞকর্মের প্রধান সহায়। অগ্নি সমিদ্ধ না হলে কোনো যজ্ঞকর্মই সম্পাদিত হয় না। বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে যে আহুতি দেওয়া হয়, অগ্নিই তা বহন করে নিয়ে যান; তিনি তাই 'হব্যবাহ'। দেবগণকে অগ্নি যজ্ঞস্থলে আবাহন করেন। সেই অগ্নিদেব আজ আবার পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছেন। এই অগ্নিকুণ্ড থেকেই জন্ম নেবে এক যুগান্তকারী ঘটনা। যা যুগ যুগ ধরে মানুষকে পথ দেখাবে।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আগে এক বসন্তকালে দশরথ শুরু করেছিলেন অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রস্তুতি। প্রস্তুতির এক বছর পর দশরথের জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির অধ্যক্ষতায় যথাযথভাবে সমাপ্ত হয়েছিল সেই অশ্বমেধ যজ্ঞ। ওই অশ্বমেধ যজ্ঞ শেষে রাজা দশরথ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তির প্রার্থনায় বলেছিলেন— ''ততোহব্রবীদৃষ্যশৃঙ্গং রাজা দশরথস্তদা। কুলস্যবর্ধনংতত্তু কর্তুমর্হসি সুব্রত''— হে শোভন সম্পাদক ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গ, আমার বংশ যাতে বর্ধিত হয় সেই আশীর্বাদ করুন।

রাজমন্ত্রী সুমন্ত্র রাজা দশরথকে পরামর্শ দিয়েছিলেন— ঈশ্বরের ইচ্ছা, অশ্বমেধ যজ্ঞে মহারাজ দশরথ যদি সেই যজ্ঞের ঋত্বিক হিসেবে তাঁর জামাতাকে বরণ করেন তবে পূরণ হবে দশরথের অভীষ্ট।

রাজা দশরথ অতীত দিনের চিন্তায় ডুবে যান। বন্ধু অঙ্গরাজ লোমপাদের হাতে দশরথ তুলে দেন তাঁর প্রথম কন্যাসন্তান শান্তাকে। আজ এতদিন অপুত্রক অবস্থায় থাকার পর পুত্রকামনার সফলার্থে কন্যা এবং জামাতাকে আহ্বান জানাতে হবে। বিভান্তক ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ অনাবৃষ্টি থেকে রাজা লোমপাদের অঙ্গরাজ্যকে বাঁচিয়ে ছিলেন। কৃতজ্ঞ রাজা লোমপাদ দশরথ কন্যা শান্তাকে সম্প্রদান করেছিলেন মহাতাপস ঋষ্যশৃঙ্গের হাতে।

রাজা দশরথকে সুমন্ত্র জানিয়েছিলেন, ঋষিদম্পতি ঋশ্যশৃঙ্গ ও দেবীশান্তা এখনও রাজা লোমপাদের অঙ্গরাজ্যে বাস করছেন। রাজা দশরথের অতি সত্বর তাঁদের কাছে যাওয়া উচিত। সুমন্ত্রর অভিমত দশরথ কিছুতেই ত্যাগ করতে পারলেন না। তিনি তাঁর পূর্ণকাম সফল করার জন্য, রঘুবংশকে নন্দিত করার জন্য, নন্দন কামনায় আকুল হয়ে উঠলেন এবং মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, তিনি যাবেন তাঁর প্রিয় বন্ধু রাজা লোমপাদের অঙ্গরাজ্যে। সিদ্ধান্তমতো গুরু বশিষ্ঠের অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে রাজা দশরথ গেলেন অঙ্গরাজ্যে। রাজা লোমপাদ দীর্ঘদিন পর বন্ধু দশরথকে দেখে বুকের মাঝে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। দু'জনের চোখ দিয়ে তখন আনন্দাশ্রু বয়ে চলেছে। রাজা দশরথ বন্ধু লোমপাদকে সমস্ত কথা জানালেন এবং পুত্রকামনার্থে তিনি যে অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে চলেছেন সেই যজ্ঞে জামাতা ঋষিপ্রবর ঋষ্যশৃঙ্গকে পৌরহিত্যে বরণ করার কামনা করলেন। উত্তম এই প্রস্তাবে লোমপাদ খুবই আনন্দিত হলেন এবং তাঁরই অনুরোধে জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গ এবং কন্যা শান্তা দুজনেই অযোধ্যায় যেতে রাজি হলেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজা দশরথ কন্যা শান্তা ও জামাতা ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে রাজধানী অযোধ্যায় ফিরলেন। শান্তার প্রথম এই পিত্রালয়ে আগমন। সবাই তাঁকে স্নেহ ও আদরে বরণ করলেন। আর ঋষি ঋষ্যশৃঙ্গকে রাজা দশরথ 'অন্তঃপুরং প্রবেশ্যৈনং পূজাং কৃত্বা চ শাস্ত্রতঃ'— অন্তঃপুরে ঋষ্যশৃঙ্গকে শাস্ত্র অনুযায়ী অভিনন্দিত করে কৃতকৃতার্থ হলেন।

ঋষ্যশৃঙ্গমুনি অশ্বমেধযজ্ঞ শেষে রাজা দশরথের তাঁর প্রতি আশীর্বাদ কামনার উত্তরে বলেছিলেন— মহারাজ দশরথ, আপনার চারটি পুত্র হবে। আর তার জন্য ঋষ্যশৃঙ্গ নিজে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। রাক্ষসরাজ রাবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য ভগবান বিষ্ণু নিজে অবতীর্ণ হবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন দেবতাদের। সেইমতো ঋষ্যশৃঙ্গের অধ্যক্ষতায় অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে আবির্ভূত হলেন রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিহিত কৃষ্ণবর্ণের এক পুরুষ। স্বর্গীয় পায়স পরিপূর্ণ এক স্বর্ণপাত্র তিনি রাজা দশরথের হাতে তুলে দিলেন। রাজা দশরথ সেই পায়েসান্ন চারভাগ করে দিলেন তাঁর তিন মহিষী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রাকে। তারই ফলে গর্ভবতী হলেন তাঁরা। জন্ম নিলে রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের তপঃপ্রভাবেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডে অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে রঘুকুল বর্ধিত হলো। চিরবন্দিত হয়ে রইল রামায়ণ কথা— মানুষের হৃদয় থেকে হৃদয়ে।

কবি জয়দেবের জয়গান আজও মানব হৃদয়ে বিশুদ্ধ ধ্বনি তুলে ধরে— বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ম্। দশমুখ-মৌলিবলিং রমণীয়ম্। কেশব-ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে॥ —দশদিকে আছে দশদিকপতি, তুমি সেই দশ দিকপতির আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে দশানন রাবণের দশটি মাথা যুদ্ধে দশদিকে করেছিলে অর্পণ, রামরূপধারী হে কেশব, হে জগদীশ, হে হরি, তোমারই হউক জয়॥ ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

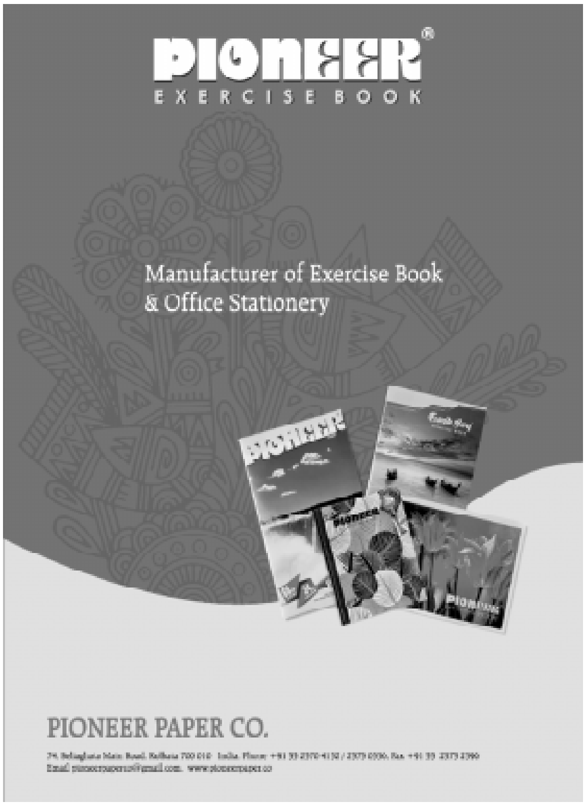

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

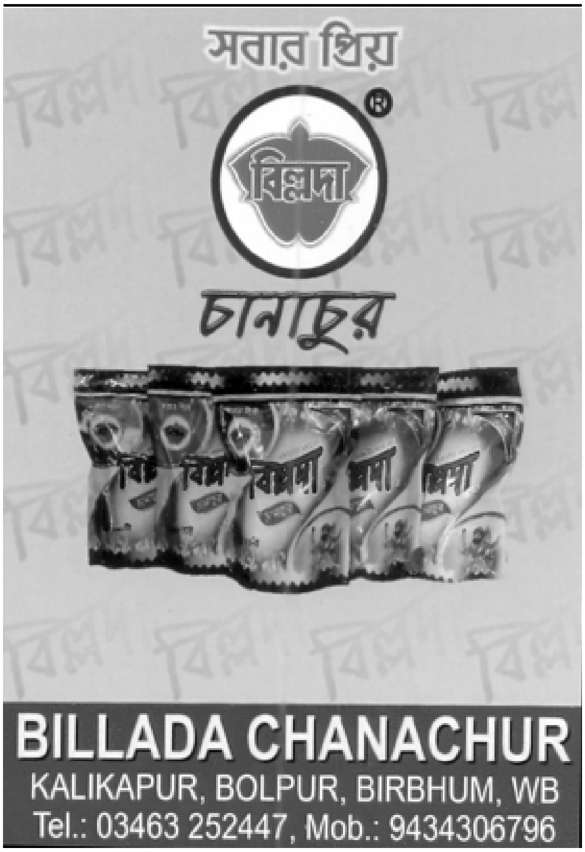

দহনভার

প্রেমাংশু বশিষ্ঠ

মেয়েটি চেম্বারে ঢুকতেই একটু থমকে গেলেন ডাঃ সেন! গরমে গায়ে কান মাথা ঢাকা কালো চাদর! বাঃ বেশ সুন্দরী তো! কুলি লাইনে এরকম সুন্দরী বউ রাখে? বিহার ইউপির লোকেরা তো দেশে রেখে আসে। তাহলে?

—কার্ড হ্যায়? মরদকা নাম কেয়া?

—বাবু আমি বাঙ্গালি মোছলমান। বাপের কাছে থাকি। বাপ ভ্যান চালায়। বাপের নাম ডালিম শেখ। চেনোনি আব্বারে?

—হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। বেশ ভালো দেখতে জোয়ান লোকটা তোমার বাবা? হয়েছে কী তোমার?

—দু' বছর ধরি পেটে বেতা করে, খাই দাই, রোগ বালাই কিচু নেই শুদু শুদু পেটে বেথা করে। বাপ বলে, টিউমার হইছে।

ডাক্তার মনে মনে চিন্তা করলেন, 'এক্সরেতে বোঝা যাবে না। অথচ সোনোগ্রাফি করানোর মতো খরচ করতে পারবে না।' কাছে কেউ না থাকলে মুসলমান মেয়েদের পরীক্ষা করা অসুবিধা বলে আর একজন মহিলা রোগীকে ডাকলেন ডাঃ সেন। সে আসতেই ডাক্তার সেন মহিলাটিকে কাছে ডেকে পেটের ওপর থেকে চাদর আর শাড়ির আঁচলটা সরাতে বললেন।

—না ডাক্তারবাবু ব্যথার ওষুধ দিন দেখাবো না।

ডাক্তারবাবু রেগে গিয়ে বললেন, ''একজন ভদ্রমহিলার সামনে পেট টিপে দেখব। ঠিক কোথায় ব্যথাটা হচ্ছে। তাতে তোমার লজ্জা করছে?

''তুমি ডাক্তার তোমার সামনে পেট দেখাচ্ছে না? পাগল নাকি? নাকি সুন্দুরী বলে খুব দেমাক?'' বৃদ্ধা মহিলাটি রেগে গিয়ে বললেন।

—দেখছেন না এত গরমেও কান মাথা ঢেকে রেখেছে মোটা কালো চাদরে। এদের সমাজে অনেক নিয়ম কানুন আছে।

'না ডাক্তারবাবু', বলে পেটের ওপরের কাপড় সরিয়ে দিল মুসলমান মেয়েটি।

ডাক্তার সেনের মুখ থেকে বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে এল, ''ইস্! গোটা বাঁদিকটাই পুড়ে গেছে! পেট বুক হাতের ওপর দিকটা ইস্! কী করে হলো?''

ভালো করে মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তারবাবু। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল মেয়েটির। কিছুটা অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। হিন্দু হলে ঠাকুর ঘরের প্রদীপের শিখায় আঁচল জ্বলে গিয়ে পুড়ে যাবার সুযোগ ছিল। রান্না করতে গিয়ে পুড়লে আগেই বলে দিত পেট ঢেকে রাখত না। ডাক্তারবাবু বুঝলেন, অন্য কোনো ব্যাপার।

''ঠিক আছে তোমার পেট টিপে দেখার কিছু নেই। টিউমার হয়েছে বলে মনে হয় না। নাম কি বল?''

''ইসরাত বেগম।''

ডাক্তারবাবু তাঁর প্যাডে কিছু লিখতে গিয়েও থেমে গেলেন। কতদিন হলো পুড়েছে? কী করে পুড়ল?

মোরা গাঁয়ের মানুষ। সোন্দর বনের গেঁওখালিতে আমার শ্বশুরের ভিটে। কাঠের উনুনে রান্না হয় ওতেই শাড়ি ধরে গেছল।

'না গো, আম্মা মিছে বলছে। আব্বা উনুনের কাঠ তুলে পুইড়ে দিছিল।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন ডাক্তারবাবু। ইসরাতের সঙ্গে আসা সাত আট বছর বয়েসের ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটা না বললেও ডাক্তারবাবু বুঝেই গেছলেন ইসরাতের চোখের জল দেখে। ডাক্তার হলেও ডাঃ সেন গল্প লেখেন। স্বভাবতই তিনি মানবিক, উপরন্তু গল্পের প্লট। জেনে নিলেন পুলিশ কেস হয়েছিল কিনা। শুনলেন হয়েছিল। ওর স্বামীর জেল হয়েছিল। তবে বেশি দিনের জন্য নয়। পাড়ার নেতাদের দয়ায় ছ' মাসের মধ্যে প্রমাণ অভাবে বেকসুর ছাড়া পায়। ডাক্তারবাবু আইনের দিক থেকে পরিষ্কার হয়ে গেলেন। যে ভদ্রমহিলাকে ডেকেছিলেন তাঁকে ওষুধ লিখে দিয়ে চলে যেতে বললেন।

''ইসরাত তোমার বাপের বাড়ি এখানে, এখানে তো এত স্কুল আছে। পড়াশুনা করলে না কেন? তাহলে তো এরমকম লোকের সঙ্গে বিয়ে হতো না তোমার?''

''আমাদের বাড়ি বসিরহাটের গাঁয়ে। এইট অবধি পড়িছি। আমার বর সামসের পেরাই আমাদের গাঁয়ে আসত। দেখতে ভালো, লম্বা চওড়া চ্যায়ারা। ইস্কুলে যেতুম ওর সঙ্গে দেখা হতো। আব্বাকে বললুম ভিনদেশি একটা জোয়ান আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা শুনে রাস্তায় ওকে ধরল। সামসেরের সঙ্গে কথা বলে আব্বা আম্মাকে এসে বলল, ''মেয়ের একটা ভালো বর পেইছি। দেকতে শুনতে এক্কেবারে রাজপুত্তুর।''

মা পেথমে না-না করল। লেখাপড়া শিকলে এরকম অনেক ছেলে পাওয়া যাবে। হেড দিদিমণি যদি শোনেন বে দিয়ে দিইছি, খুব রেগে যাবে। বিপদ হবে।

সামসেরকে নিয়ে ডালিম শেখ আর কিছু বলল না বউকে। শুধু মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল ''চিঠিপত্তর কিছু দেয়নি তো তোকে?''

মেয়ে ঘাড় নাড়ল।

কোনো রোগী নেই দেখে চেম্বারের দরজা আধা বন্ধ করে ডাঃ সেন শুনতে লাগলেন ইসরাতের কথা।

ডালিমের বাবা অসুস্থ। ক্যানসার হয়েছিল গলায়। এখন অনেকটাই ভালো হয়ে গেছে। এক কবিরাজি ডাক্তার জড়িবুটি খাইয়ে ভালো করে এনেছে। ডাক্তারের কথামতো গোরু তো কোন ছাড় মাংস, মাছ সব ছেড়েছে। খুব নিয়ম শৃঙ্খলায় থেকে এখন ভালো আছে। ডালিমের প্রথম মেয়ে সন্তান ইসরাত। আর একটা ছেলে হয়েছিল সে তিন বছর বয়েসে মারা গেছে। বাবার অসুখ হয়েছে বলে বাবার ভ্যানটা সে চালায়। এটাই

তার রুজিরোজগার। ম্যাট্রিক পাশও সে করার সুযোগ পায়নি। সবরকম দুরবস্থাকে মেনে নিয়ে হাসিমুখে সারাদিন পরিশ্রম করে। কিন্তু পাড়াপড়শির কথা শুনে মেয়ের বিয়েও দেয়নি। সুন্দর দেখতে বলে অশিক্ষিত খারাপ পরিবারের লোকজন ডালিমকে বলে মেয়েকে সাদি দিতে তাদের ছেলেদের সঙ্গে। কিন্তু ওর এক গোঁ— ভালো ঘর চাই, লেখাপড়া জানা ছেলে চাই।

ডালিম আর দশটা ছেলের মতো বোকা বা বদ নয়। ঘটকদের সে বলে, ''এখনকার ভালো ছেলে? অনেক দেখেছি! একটা ভালো ঘরের মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে দু' চারদিন পর খারাপ ব্যবহার করে, এখন তো হিন্দুদের মতো টাকা আনতে বলে বাপের ঘর থেকে, না আনলেই মারে, গরম তেল গায়ে দেয়। না না পড়ুক, পাশ করে কলেজে পড়বে। সেলাই শেখাবো টেলারিং স্কুলে রেখে। চাকরি না পেলে ব্যবসা করবে। লেডিস টেলারিং বানাবো মেয়ের জন্যে। না না বিয়ে দোব না। কোনো ছেলের পেটে কী আছে দেখে বোঝা যায়? হয়তো ইসলামে নিয়ম আছে বলে চরিত্রহীন ছেলে দু' তিনটে বিয়ে করে ফেলল সখ করে? তখন আমার মেয়ের কী হবে? যুগ পালটেছে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে।''

ডালিম আর ডালিমের বউ দুজনেই অনেক ভেবে চিন্তে অজানা অচেনা পরিবারের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাজি হন না। মনসুরকে হাসিমুখে ডালিম বলে দিল— মেয়ের বিয়ে দিব না এখন। পাঁচ ছ' বছর পর ভাবব। মনসুরকে নিজের সম্পর্কে অনেক কিছু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলত। ভালোমানুষ সেজে বহু মিথ্যে কথা বলেছিল স্থানীয় মনসুরকে। মনসুর মাছের কারবারি, লেখাপড়া জানা পয়সাওয়ালা লোক। এলাকায় প্রভাব ছিল যথেষ্ট। সেটাই কাজে লাগিয়েছিল সামসের।

বেশ কিছুদিন কোনো যোগাযোগ করেনি সামসেরের সঙ্গে কিংবা ইসরাতের সঙ্গে। কিন্তু স্কুল যাবার সময় আড়ালে আবডালে দেখত ইসরাতকে।

ডাক্তারবাবু এ অবধি শুনে বলে উঠলেন, ''তোমরা বোকা। তুমি তা লক্ষ্য করে ওর ওপর দয়া করলে এই তো?''

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইসরাত বলল, ''নসিব বাবু! মনসুরচাচার মেয়ে পড়ত আমাদের স্কুলে। চাচার বাড়িতে বসে যেসব ঝুটা কথা বলত সামসের। তা বিশ্বেস করে বন্ধু আমিনা আমাকে বলত। জানেন তো বাবু, মেয়েছেলেদের মন কত নরম? কত বোকা মোছলমানদের মেয়ে! আমি নিজেই নিজের সব্বনাশ করলুম। মনে বোধায় ভুত ঢুকেছিল। সবসময় সামসেরের কথা মনে ঘুরঘুর করত। মনে হতো বেচারা আমার জন্যি পাগল আমি এমন কে যে ভ্যানওলার মেয়ে হয়ে নিজির দর নে মাথা খারাপ করব? ওর বাপ আম্মা বে'র কথা পাড়লে আমার আব্বা নিচ্চয় মেনে নেবে।

নানান চিন্তায় কিশোরী ইসরাত রাতারাতি যুবতী হয়ে উঠল, স্কুলের পড়ায় মন বসছে না, মেয়ে উদাসী, মা বোধায় বুঝল তার কলিজার টুকরো একমাত্র মেয়ের কথা। জেনেও নিল মনের কথা। প্রথমে অনেক আপত্তি সত্ত্বেও ডালিমকে ঠিক করল তার একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে। মেয়ে সামসেরের থেকে প্রায় চোদ্দ বছরের ছোট বলে মনে একটু খুঁত থাকল, খুঁত থাকল মাছের কারবারি বলে। যদিও সামসের বলেছে মাছের কারবারি, ড্রাইভারদের মতো সে মদ খায় না। তার বাবা নাকি ভীষণ ভালো মানুষ। খুব ধার্মিক। খাঁটি মুসলমান বলে মদ কোনোদিন ছোঁননি তার বাবা। নিজের জোতজমি আর কেতাব নিয়েই নাকি থাকে তার বাবা। ''তোমার বাবা ওদের গ্রামে গিয়ে খোঁজ খবর নিল না?'' ডাঃ সেন জিজ্ঞাসা করলেন। —''আব্বা ওদের গাঁয়ে যাবার আগে শুশুর আর শাউড়ি আমাদের বাড়ি চলি এল। টুপিওলা পাকা দাড়িওলা হাতে পুঁতির মালা, মুখে সব সময় আল্লার নাম। শাউড়িকে দেখতে খুব ভালো ছিল। খুব শান্ত বলি মনে হলো। শুধু একটা কতাই বলল, ''মাইন্যে নেবার চেষ্টা করবে। আমরা মেয়েছেলিরা সব কিছু মেনে নিই।'' বাবা ভ্যান চালায় সময় করে সামসেরের সঙ্গে তার লরিতেই চলি গেল। সন্ধ্যেয় পৌঁছে ভয় ভয় করছেলো। সোঁদরবনের গাঁ, লাইট নেই। লোকজন সন্ধ্যেতেই ঘরে ঢুকে যায়। খুব ভয়ে ভয়ে ওখানে রাত কাটিয়ে ভোরেই সামসেরের লরি করে আমাদের গাঁয়ে চলি আসে। ঘরদোর সাজানো গুছোনো, শাউড়িটা ভালো মানুষ, শুশুরটা বেশ রাগি। তবে আমাকে বউ হিসেবে পেলে মেয়েদের ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে, একথা দিয়েছেল ওর বাপবুড়োটা।

বে হয়ে যাবার পর দু' তিন দিনেই বুঝতে পারলুম কত বড়ো বদমাস ওরা। গাঁয়ের মানুষ এরা কিন্তু পাশের লোকজন তেমন গল্পগুজব করতি তো আসে না! ঘরে রাতের বেলা ছাড়া বরের সঙ্গে কতা বলার নিয়ম নেই মোছলমাল মেয়েদের। শ্বশুরের গায়ে পায়ে তেল মাইখ্যে দিতি হতো, তার নাকি বাত আছে, ওই সময় আমার হাতে পিঠে হাত দেত। কত মিঠে কতা বলত। বলত— তুই বড়ো সুন্দুরী, তোরে ভালো শাড়ি কিনি দোব, গয়না দুব। বুঝতি পারলুম ও বেটা খারাপ চরিত্তিরের। বলতে সাহস পাইনে কাউরে। একে নতুন বউ তায় গরিবের মেয়ে। একদিন গাল টিপি দিল। শাউড়িকে বললুম, শাউড়ি বলল, তেল মাখাবি নে, বলবি তুমি আমার গায়ে হাত দাও, তোমার ছেলেরে বলে দোব।

অবশ্য ছোট্ট মেয়েটার সাহস হয়নি সেকথা মুখ ফুটে বলার। ও নিজের গাঁয়েও দু'এক ঘরের দুশ্চরিত্র খারাপ লোকদের জানে যারা মুখে আল্লা হাতে মালা কিন্তু মেয়ে পেলেই তাদের কুৎসিত পৌরুষটা জেগে ওঠে। হিন্দু ঘরেও নাকি ঘটে এরকম ব্যাপার। একটা নাকি ঘটেছিল। ইসরাতের মায়ের বান্ধবী। সে চটি খুলে তার এক ভাসুরকে মেরে পাড়ার লোক জড়ো করে ছেড়েছিল। একথা মনে আসতে ইসরাতের মাথা গরম হয়ে উঠত। সামসের কোনো রাত্রে ফিরলেও তার স্ত্রীর ঘুমবার আগে ছাড়া বরের ঘরে ঢোকা নিষেধ, কোনো কোনো দিন ফিরতও না ঘরে। একদিন সামসেরকে বলল, 'ইস্কুলে ভর্তি করে দেবে বলেছিলে, ভর্তি করে দেবে? আমি দিনিরবেলা ঘরে থাকব না। 'কেন, থাকবি না কেন? আম্মাই তো রান্না করে তোর তো হেঁসেল ঠেলতি হয় না। বাবা বলি দেছে পড়াটড়া হবে না। এ গাঁয়ে কোনো বউ ইস্কুল কলেজে পড়ে না। ঘর কর। বাচ্চা হলি তারে ভালো করি পড়াস।' ইসরাতের চোখে জল এসে গেল। তোমার আব্বা আমায় পড়তি দেবে কেন? তাহলে তেল মাখানোর নাম করে কচি বউয়ের গায়ে হাত দেয় কেমন করি? নচ্ছার লোক।

—অ্যাঁ? আগেরটার গায়ে হাত দিত তোর গায়েও হাত দেয়?

'আগেরটা' শুনে থমকে গেল ইসরাত। কান্না থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার আর

একটা বিবি ছেল আগে?’

‘‘হ্যাঁ। কী হয়েছে তাতে? তারে তো তালাক দিছি। মোটা কালো ধুমসি। বাচ্চা কাচ্চা হয় না তালাক দেবে না তো কী?’’

‘‘মিথ্যে কতা বলে আমায় সাদি করলে? গাঁয়ের ইস্কুলি পড়ছিনু। বাপ মা’র একটাই মেয়ে। আমার কত আদর। ফেউয়ের মতো লেগে ছিলে তুমি। পাড়ার লোক বলেছে আমার জন্যি নাকি পাগল পাগল হয়ি গেছিলে, শেষে দয়া হলো মায়ের— ইস এত খারাপ লোক তোমরা? মিথ্যে কতা বলি আমার জীবন নষ্ট করলে? আল্লা তোমারে ক্ষমা করবে না। তোমার আব্বা তো সারাদিন মুখে আল্লা আল্লা করে। আল্লা জানে সে একটা আস্ত শয়তান।

আব্বার ওপর খুব খুশি ছিল না সামসের। ছোটো বয়স থেকেই বাবার খারাপ স্বভাবের জন্য সে পছন্দ করে না। কালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে অনেক টাকা নিয়েছিল বাপ, একটা টাকাও ছেলেকে দেয়নি। ঠিকমতো লেখাপড়া না শিখিয়ে গাড়ি চালানো শিখিয়েছে। লরির টাকা নিয়ে তবে ওই কালো মেয়েকে ঘরে নিয়েছিল। আব্বা যে নিষ্ঠুর তা সে ছোটো বয়েস থেকেই জানে। আম্মাও বাবাকে দু’চক্ষে দেখতে পারে না। পার্টি করে, পঞ্চায়েতের মেম্বার বাপের বন্ধু এজন্যে মা ভয় পায়। সামসের সামসেরের মা জানে ওর বাবা প্রয়োজনে লোক দিয়ে নিজের বউ ছেলেকে খুনও করিয়ে দিতে পারে। তালাক দিয়ে আর একটা বিয়ে করার জন্যে ওর বাবাই ওকে জোর করেছিল। ভেবেছিল পরের শ্বশুরের কাছ থেকে আবার টাকা নেবে। দোতলাটা তুলে নেবে সেই টাকায়। কিন্তু ...

এই অবধি চিন্তা করতে করতে সামসের তার বউয়ের দিকে মন দিল। ‘‘শোন। রাগ করিস না। বাপের কথাতেই আগের বউরে তালাক দিয়েছি। বাপ একটা হারামি। পঞ্চায়েতটা বাপের মতোই হারামি। বাপের দোসর। বাপেরে ভয় পাই আমি। ঠিক আছে ইস্কুলে ভর্তি করব কিনা পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথা কয়ে দেখি। সে রাজি হলে আব্বা চুপ।

ইসরাতকে আদর করে চোখ মুছিয়ে সামসের ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলল, ‘‘এত সাহস ঘাটের মরার? আম্মাকে নিয়ে বুড়োর সাধ মেটে না? দেখছি দাঁড়া। তোর বাড়ি গে থাকব। ভেবেছি কী তোর শ্বশুর?

খুব চেঁচিয়েই বলছিল কথাগুলো। কানে যেতেই ভয়ে ভয়ে এগিয়ে এল সামসেরের বাবা। চতুর লোক, হাসতে হাসতে বলল, কী বলছিস সামসের? বউমার বয়েস কম, তাই ওর ভয়টা খুব বেশি। আমার হাতটাত ওর গায়ে লেগি গেছে। বেটার বউ তুই, আমার মেয়ের মতো। তোরে আমি খারাপ করতি পারি? যা কাল থিকে তেল মাখাসনি। আমার বিবিই মাখিয়ে দেবে।

সামসেরের বাবা খুব ভয় পেত তার পুলিশে চাকরি করা শ্বশুরকে। তাই নিজের বউকে প্রথম থেকেই ভয় পায়, সমীহ করে। এক বউ নিয়েই জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। মুখ ঝামটা শুনেও নিজের বউকে কিছু বলতে সাহস পায় না।

ডাঃ সেনের চেম্বার বন্ধ করার সময় হয়ে গেছে। তাই অপেক্ষায় আর কোনো রোগী নেই। শুধু এক বৃদ্ধা বসে আছেন। কিছুক্ষণ আগেই এসেছে।

‘‘মাসিমা আসুন প্রেসারটা মেপে দিই’’ বলে ডেকে নিলেন বৃদ্ধাকে। বৃদ্ধার রক্তচাপ মেপে, শরীরের কথা জেনে প্রেক্রিপশন করে দিলেন। চলে যাবার সময় বৃদ্ধা রোগী বললেন, ‘‘মা তোর কথা পাশের ঘরে বসে শুনছিলুম। তোদের সমাজের কথা তো জানি না। বুঝতে পারলুম বড়ো কষ্ট তোদের। খবরের কাগজে, টিভিতে খবর দেয় জানি। আমাদের বাড়ি ওই কালীতলার ভট্চাজ বাড়ি। মেয়েকে নিয়ে আসিস আমি ওকে মানুষ করে দোব। আমার ছেলের বউ এখানকার হাই ইস্কুলের মিসট্রেস। আসিস। দেরি হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু আমি যাচ্ছি’’ বলে চলে গেলেন।

ডাক্তারবাবু বললেন, ‘‘কম করে বল। বাড়ি যাব। পরে শোনা যাবে বাকিটা।’’

‘‘পেটে মেয়ে এল। ইস্কুলে আর পড়া হলো না। মেয়ে বড়ো হচ্ছে। পাড়ায় বদমাস কম নেই। বাচ্চাটার দিকে নজর। শুনিছি গায়ে ছেলে ধরা আছে। আমিই ঘরে পড়াই মেয়েকে। এক ননদ মুর্শিদাবাদে থাকত। বছরে দু’ তিনবার এলি কান ভাঙাতে। মেয়েকে ননদের হাতে দিতি ভয় করত। শাশুড়ির সঙ্গে এ নে ঝগড়া হতো। মোর তো এক গোঁ। এই গেঁয়োদের সঙ্গে মিশতি দোব না। পড়া শিখাব, এম.এ. পাশ করাবো।

বর মদ খেত। মেয়ে হবার পর বারণ করতুম। বলতুম মোর বাপ মা দেখলি ওদের কাছে তুমি ইজ্জত পাবে না। শাশুড়ি, শ্বশুর সব ছেলের পক্ষ নিত। আমি ঝগড়া-ঝাটির থিকে বাঁচবার লেগ্যে বাপের কাছে গে থাকতুম। মোছলমানদের মেয়ে তাতেও বদনাম। মেয়ের দু’ বছর বয়েসে তো বাড়ি শুদ্ধ সব এক কথা। মেয়ে দে কী হবে? বে হয়ে যাবে। পেটে ছেলে ধর। ‘‘মোর এক মেয়েই বড়ো হবে। পড়া শিকবে...।’’ একবার রোজ রোজ খুটিনাটি নিয়ে আমায় কথা শুনাত, গালি দিত, মোরা ভিখারি, গরিব, ওদের ছেলেকে বাগিয়ে বে করেছি— এ ধরনের কথায় কথায় শেষ করি দিত ওই শয়তানরা। শেষে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি ফিরি এলাম।’’

সামসেরের যাতায়াত আছে ইসরাতদের গ্রামে। চারিদিকে ছড়িয়ে দিল— আমার বউ সংসার করতে চায় না, ওর চরিত্র খারাপ। মোছলমানদের ঘরে সোন্দর ছেলের অনেক দাম। লরি করে মাছ আসে। ছেলে রোজগার করে ভালো। সামসেরের বে হলো। হিন্দুদের মতো তো আইন নেই। রাগে দুঃখে চলে গেল সামসেরের ঘরে। সতীনের সঙ্গে ঘর। নতুন বউ পুরনো বউকে সইবে কেন? সে শুনে এসেছে পুরনো বউ ঘর করবে না, মেয়ে নিয়ে সুখে থাকে। স্বামী স্ত্রী উপরন্তু শ্বশুর, সব মিলিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল ইসরাতের জীবন। নতুন বউ সামসেরকে বলল, তাড়াও ওটাকে, ওর বড়ো গোমর লেখাপড়া শিখেছে বলে। সামসের একদিন রাগে উনুনের জ্বলন্ত কাঠ দিয়ে ইসরাতকে মারল। জ্বলন্ত কাপড় নিয়ে ছুটে বাইরে না এলে মরেই যেতে হতো। মরল না পুড়ল। বেঁচে গেল মুখ। চোখ, হাতের অনেকটা অংশ পেটের দিকে চামড়া ঝলসে গেল।

তারপর সব বিক্রি করে এই বস্তি এলাকায় চলে এলে তোমরা? এই কারখানা, জুট মিলের পাড়ায়?

মনে মনে একটা না জানা সমাজের সংসার জীবনের কথা শুনতে শুনতে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল ডাঃ সেনের মন। ‘‘আর না, আর না, থাক।’’

ডাঃ সেন এক হাসপাতালের ডাক্তারের নামে চিঠি লিখে বললেন, ‘‘তোমার আব্বার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে ড. শ্যামল ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করবে। কাছেই হাসপাতাল। যখন সময় পাবে আসবে এখানে। চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার সেন। ■

সুনীতিকুমারের ভাবনায় বাঙ্গালি মুসলমান

গৌতম কুমার মণ্ডল

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত যে কোনো ব্যক্তির কাছেই সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) একটি অতি পরিচিত ও প্রিয় নাম। বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক, বহুভাষাবিদ মনীষী ও প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর নাম আমরা মনে রেখেছি। 'The Origin and Development of Bengali Language' (1926) যা সংক্ষেপে ODBL নামে পরিচিত, তাঁর অসামান্য গবেষণাগ্রন্থ। বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা সুনীতিকুমারকে ছাড়া অসম্ভব। 'ভাষা প্রকাশ : বাংলা ব্যাকরণ' তাঁর বিখ্যাত ব্যাকরণগ্রন্থ। এছাড়া 'দ্বীপময় ভারত' (১৯৪০), 'ইউরোপ' (১৯৩৮), 'সাংস্কৃতিকী' (১ম খণ্ড ১৯৬১, ২য় খণ্ড ১৯৬৫) বহু তথ্যে ভরা তাঁর প্রবন্ধগ্রন্থ। সুনীতিকুমারের একটি বই হলো 'বাঙ্গালির সংস্কৃতি'। খুব ছোটো বই। প্রথম প্রকাশ ২১ মে, ১৯৯০। প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। বইটির মোট প্রবন্ধের সংখ্যা ৬। এর মধ্যে একটি বিশেষ প্রসঙ্গে আমরা প্রথম প্রবন্ধ 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি গ্রহণ করব। প্রসঙ্গটি হলো আজকের বাঙ্গলার মুসলমান সমাজ ও সুনীতিকুমারের ভাবনা।

'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি একটি বড়ো প্রবন্ধ, সুলিখিত; বাঙ্গালি জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের আলোচনায় অবশ্যপাঠ্য। স্বাভাবিকভাবেই বাংলা সাহিত্যের সাম্মানিক স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্বের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবন্ধটি পড়তে হয়। খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালি মুসলমানদের প্রসঙ্গ এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে। কারণ বাঙ্গালি মুসলমানদের বাদ দিয়ে বর্তমান বাঙ্গালির জাতির পরিচয় তো সম্পূর্ণ হয় না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় বঙ্গপ্রদেশে তুর্কি আক্রমণ হয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনালগ্নেই (১১৯৯ বা ১২০২)। তুর্কি যোদ্ধা ইফ্‌তিকার-উদ্দিন-বিন-বখতিয়ার খিলজি 'মুষ্টিমেয় অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে ও চাতুরির দ্বারা লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করে। অতর্কিত আক্রমণে বিভ্রান্ত, অরক্ষিত পুরীর অধিনায়ক বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন সপরিবারে পূর্ববঙ্গের নিরাপদ অঞ্চলে পলায়ন করেন (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। এরপর থেকেই বঙ্গপ্রদেশের শাসনক্ষমতায় উঠে আসে বিদেশাগত তুর্কি-পাঠান সুলতানেরা। তারা ইসলাম মাতাবলম্বী। প্রজারা ভয়ে-ভক্তিতে ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলেন। ভীত-সন্ত্রস্ত হিন্দু সমাজ। সাহিত্য সংস্কৃতির ধারা শতাধিক বছরের জন্য প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল। এই ভীত হিন্দু সমাজকে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর যিনি সাহস জোগালেন তিনি চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। দোর্দণ্ডপ্রতাপ পাঠান সুলতান আর কাজির বিরুদ্ধে অহিংসা আর প্রেমের মন্ত্র নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। চৈতন্যের সরল ঈশ্বরভক্তি আর জীবপ্রেমের কাছে মাথা নত করলেন মুসলমান কাজি। একথা হয়তো অসত্যভাষণ নয় যে, যদি চৈতন্যদেবের জন্ম না হতো তাহলে বঙ্গপ্রদেশের হিন্দু সমাজের অস্তিত্ব হয়তো বহুদিন আগেই লুপ্ত হয়ে যেত। হিন্দু সমাজকে সাহস জোগানো ও সংহত করা ছাড়াও চৈতন্যদেব বাঙ্গালিকে বৃহত্তর ভারত-চেতনার সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। ক্রমশ বাঙ্গালি বিদ্যার্থী, পণ্ডিত, এমনকী বণিকদের জন্য খুলে গেল উৎকলদেশ, দাক্ষিণাত্য, উত্তর-ভারতের নানা পথ। সুনীতিকুমার তাঁর প্রবন্ধে এই বিষয়টিও আলোচনা করেছেন— "বাঙ্গালির প্রতিভা বাঙ্গালার বাহিরে আদর পাইল— মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়, হিন্দু-যুগের অবসানের পরে, বাঙ্গালি গ্রামীণ সভ্যতার গণ্ডী প্রথম কাটাইয়া, নিখিল ভারতীয় সভ্যতার অংশ গ্রহণের একটা বড়ো সুযোগ পাইল।"

সুনীতিকুমার তাঁর 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধটি রাঁচির হিন্দু ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব কর্তৃক আহূত সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ রূপে পাঠ করেন। তারিখ ২১ কার্তিক,১৩৪১ সন। পরে এই

বাঙ্গালি মুসলমানদের অনেকেই যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, তাঁদের অনেকেই যে একটা কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছেন রাজ্যের সদ্য নৈরাজ্য দেখে তাই মনে হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উচিত সুনীতিকুমারের রচনা পাঠ করা। হয়তো আমরা সঠিক দিশা সেখান থেকেই পেতে পারি।

লেখাটি লেখকের ‘ভারত সংস্কৃতি’ (১৩৬৪ সন) নামক প্রবন্ধ গ্রন্থে স্থান লাভ করে। প্রবন্ধটি লেখার সময়কাল হলো ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে। তখন অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশ। এই সময় ‘বাঙ্গালি জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।’ কিন্তু এই মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা ছিলেন ‘সাধারণ বাঙ্গালি মুসলমান’ তাঁরা ধর্মচেতনার জন্য আরবি-ফারসির তোয়াক্কা করতেন না। এঁদের মাতৃভাষা বাংলা, উর্দু এঁরা বাপের জন্মে শোনেননি। আরব দেশের প্রতি এঁদের কোনো আকর্ষণও ছিল না। গ্রাম-গঞ্জের সহজ, সরল, চাষাভুষো মানুষ ছিলেন এঁরা। ধর্মগতভাবে এঁরা গোঁড়া ইসলামি রীতিনীতি অপেক্ষা ইসলামি সুফি-দরবেশ-পির-ফকিরদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হতেন। এক উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় ভাবনা এঁদের বিরোধ তো দূরে থাক, মিল ও সহাবস্থান ছিল বেশি। সুনীতিকুমার লিখেছেন— ‘‘সাধারণ বাঙ্গালি মুসলমান (কতকগুলি বিশেষ প্রান্তে, বিশেষ কতকগুলি গোষ্ঠী বা পরিবার ব্যতীত), বিশিষ্ট মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিল। যে দুই-চারিজন বড়ো আলেম, মোল্লা ও মৌলবি বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে হইতেন, তাঁহারা নিজেদের আরবি ফারসি জগতের খবর বাঙ্গালির কাছে বেশি করিয়া পৌঁছান নাই। কিছু কিছু আরবি প্রার্থনা, মুসলমানি স্মৃতি-শাস্ত্রের কথা এবং মুসলমানি ইতিহাস পুরাণ কেচ্ছা কাহিনি বাঙ্গলায় অনুদিত হইয়াছিল, এইটুকু মাত্র। উত্তর ভারতের এবং ভারতের বাহিরের দেশের মুসলমান সংস্কৃতির সহিত এবং কোরান অনুমোদিত ইসলামের সহিত বাঙ্গালি মুসলমান অতি আধুনিক কালে— বিগত মাত্র ২৫/৩০ বৎসর মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু নানা কারণে তাহার জীবনে সে পরিচয় কার্যকর হইতেছে না।’’

সুনীতিকুমার এই প্রবন্ধে আরও জানিয়েছেন, ‘‘ফরমাইস দিয়া ইচ্ছামতো ‘জাতীয় সংস্কৃতি’ তৈয়ার করা চলে না।’’ জাতীয় সংস্কৃতি একটি স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক বিষয়, তার ইচ্ছামতো নির্মাণ চলে না। কিন্তু সুনীতিবাবুর এই প্রবন্ধটি লেখার পাঁচ-সাত বছর আগে থেকেই ‘ইসলামগত প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম মোল্লা মৌলবিদের’ চেষ্টায় বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে ‘ইসলামি সংস্কৃতি’ আনার সচেতন প্রয়াস দেখা গেছে। তাঁরা তৈরি করতে চাইলেন এক নতুন সংস্কৃতি। সুনীতিকুমার আক্ষেপ করেছেন এই প্রয়াসের মধ্যে ‘‘পজেটিভ অর্থাৎ সংগঠনকারী দিক অপেক্ষা নেগেটিভ অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিকটাই প্রবল। ইঁহাদের কাছে ইসলামীয় মনোভাব মানে মুখ্যত যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী; কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দুত্ব ইঁহাদের চোখে ‘কুফ্‌র’ বা বিধর্মিত্ব এবং ‘শিরক্‌’ বা বহু-দেব বাদীত্বেরই নামান্তর। হিন্দু বা ভারতীয় মাটিতে জন্ম— এই কথাতেই যেন কুফ্‌র ও শিরক্‌-এর আমেজ লাগিয়া আছে; তাই বহু ভারতীয় বা বাঙ্গালী মুসলমান নিজেকে সৈয়দ বা আরব, অথবা ইরানি, পাঠান, মোগল বা তুর্কি বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিতে পারিলে কৃতার্থ হয়। বাঙ্গালি বা ভারতীয় মুসলমানদের এই আত্মমর্যাদাবোধহীনতা তাহাদের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষেও বটে--- এক হৃদয়বিদারক, সর্বনাশকর ট্রাজেডি।’’

খুব দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়, যে সর্বনাশকর ট্রাজেডির সন্ধান সুনীতিকুমার আজ থেকে ৯০ বছর আগে পেয়েছিলেন, আজ আমরা তার ভয়ংকর ও বিনাশের রূপের সামনে দাঁড়িয়ে। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মুসলমানদের মনে ভারত বিদ্বেষের বীজ বপন করা হচ্ছে। এতে অনেকেই বিভ্রান্ত। দেশের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ কত দূর পর্যন্ত গেলে দেশের সুন্দর ও সাজানো সম্পদ নষ্ট করা যায় তা আমরা নিজেদের চোখে দেখলাম। গণতন্ত্রে দেশের বা রাজ্যের সরকারের বিরোধিতা সহজেই করা যায়। গণতন্ত্রের স্বার্থেই এই বিরোধিতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বিরোধিতা এক জিনিস আর সমবেতভাবে পরপর বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস কিংবা ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ স্লোগান দেওয়া বা পাকিস্তানের পতাকা ওড়ানো আর এক জিনিস। মনের মধ্যে পুষ্ট হতে থাকা ভারতীয়ত্বের প্রতি বিদ্বেষ এ জাতীয় নৈরাজ্যের মধ্যে ডানা মেলাতে থাকে। দলমত নির্বিশেষে সমস্ত রাজনৈতিক দলের এ-জাতীয় নৈরাজ্যের বিরোধিতা করা উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগা দেশ। সেরূপ উদ্যম সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে দেখা যায়নি। এইসব রাজনৈতিক দল মুসলমানদের শুধু ভোটার করে রেখেছে। তারা শুধুই ভোটব্যাঙ্ক। ভোটের স্বার্থে দেশভাবনা অনেক সময়ই পিছনে পড়ে যায়। এভাবেও পথভ্রষ্ট হচ্ছেন দেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যালঘু সমাজ।

কিন্তু আশার আলো যে কিছু নেই তা নয়। গ্রাম-গঞ্জ মফস্‌সলের বহু সাধারণ মুসলমানের মধ্যে দেশের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা আছে। এই ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। এদের প্রতি কোনো কারণে সন্দেহ পোষণ করা বা জেহাদিদের প্রতি বিদ্বেষ জানাতে গিয়ে এদের কথা টেনে আনলে এদের মনকে তা ভারাক্রান্ত ও বিরূপ করে তুলতে পারে। তখন সুবিধা হয় সেই পাকিস্তানপন্থী মুসলমানদেরই। সাধারণ বাঙ্গালি মুসলমানদের মনকে আরব দেশের দিকে ঘোরানোর চেষ্টা চলছে প্রায় শতবর্ষ ধরে। আলেম-মোল্লাদের নিরন্তর প্রয়াস, মুসলমান মহল্লায় মহল্লায় আরব-পাকিস্তানের জয়গান ও মুসলিম ব্রাদারহুডের উচ্চকিত ঘোষণা, বহু অবৈধ মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী সাধারণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। এই বিভ্রান্তির ফল যে ভালো হচ্ছে না তা আমরা প্রায়ই দেখছি। সুনীতিকুমার এই প্রসঙ্গেই লিখেছেন--- ‘‘বাঙ্গালি মুসলমানদের প্রকৃতি এবং ইসলামধর্মী অন্যান্য জাতির মনের ও সভ্যতার প্রকৃতি ভালো করিয়া না বুঝিয়া, বাঙ্গালি মুসলমানের মনকে চালিত করিবার চেষ্টা করিলে, একটা কিম্ভূতকিমাকার বস্তুই সৃষ্ট হইবে, সত্যকার জাতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টি হইবে না।’’

বাঙ্গালি মুসলমানদের অনেকেই যে আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি, তাঁদের অনেকেই যে একটা কিম্ভূতকিমাকার অবস্থার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছেন রাজ্যের সদ্য নৈরাজ্য দেখে তাই মনে হচ্ছে। এই কঠিন সময়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের উচিত সুনীতিকুমারের রচনা পাঠ করা। হয়তো আমরা সঠিক দিশা সেখান থেকেই পেতে পারি। ■

দূরবিন

হ্যান্স লিপার্সি নামে এক ওলন্দাজ চশমাওয়ালা প্রথম দূরবিন তৈরি করেন। সেই সময় ইতালি দেশীয় বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা গ্যালিলিও বেঁচে ছিলেন। তিনি ওই দূরবিনের কথা শুনে নিজে ওরকম একটা দূরবিন তৈরি করলেন। তখনকার দূরবিনগুলা অবশ্য খুবই ছোটো ছিল। কিন্তু ওই দূরবিন দিয়েই গ্যালিলিও আকাশের বিষয়ে এমন সব কথা জানতে পেরেছিলেন যে, লোকে তা শুনে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। অনেকে বিশ্বাস করতে না পেরে তাঁকে নানাভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি।

গ্যালিলিও তাঁর দূরবিন দিয়ে দেখলেন যে, চাঁদে বড়ো বড়ো পাহাড় আছে, বৃহস্পতি গ্রহের চারটি চাঁদ আছে, শুক্রগ্রহের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। গ্যালিলিও তাঁর দূরবিন দিয়ে দেখে যখন বললেন যে, সূর্যের গায়ে কালো কালো দাগ আছে, তখন সকলে হেসে উঠল। অনেকে বলল 'ও কালো দাগ তোমার চোখেই আছে'।

এখন আমরা জানি যে, গ্যালিলিও ঠিক কথাই বলেছিলেন। তাঁর সময় থেকে এ পর্যন্ত ভালো ভালো বড়ো বড়ো দূরবিন তৈরি হয়েছে। সেসব দূরবিন দিয়ে আজকালকার লোক যা দেখছে তা গ্যালিলিও দেখে যেতে পারেননি। ভবিষ্যতে আরও বড়ো বড়ো তৈরি হবে সন্দেহ নেই। তার সাহায্যে যা জানা যাবে, না জানি তা কত আশ্চর্য।

দূরবিনের কথা বলতে গেলে হার্শেল সম্পর্কে কিছু বলতেই হয়। ইনি প্রথমে সৈনিক ছিলেন। চাকরি থেকে ফিরে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি দূরবিন দিয়ে আকাশ দেখতে ভালোবাসতেন। কিন্তু তাঁর ভালো দূরবিন ছিল না। কেনারও সাধ্য ছিল না। তাই তিনি ঠিক করলেন নিজেই একটা দূরবিন তৈরি করে নেবেন। দূরবিন তৈরি করা তেমন কঠিন কাজ নয়। তার নল বা স্ক্রুপগুলি সহজেই তৈরি করে নেওয়া যায়। কিন্তু এর মধ্যে আসল জিনিস যে ওই কয়েক খণ্ড কাচ তা তৈরি করতে ভয়ানক বুদ্ধি আর পরিশ্রমের দরকার। বড়ো কাচখানি গড়তে এত পরিষ্কার হাতের দরকার হয় যে, তার কোনো জায়গায় এক ইঞ্চির কুড়ি ভাগের একভাগ মাত্র ভুল হলেও তাতে কাজ আটকায়। ওই বড়ো কাঁচখানিই দূরবিনের প্রাণ। কোনো কোনো দূরবিনে কাচের বদলে একটা আরশি থাকে। হার্শেল ঠিক করলেন আরশিওয়ালা দূরবিনই তৈরি করবেন। আর ভয়ানক পরিশ্রম করে হার্শেল দূরবিন তৈরি করেছিলেন। তখনকার দিনে তাঁর তৈরি দূরবিনই সবার চেয়ে বড়ো ছিল।

হার্শেল অনেক দূরবিন তৈরি করেছিলেন। বড়োখানির আরশিটি চারফুট চওড়া ছিল। তারপর ছ'ফুট চওড়া আরশিওয়ালা বানান। এত বড়ো ক াচওয়ালা দূরবিন এপর্যন্ত কেউ বানাতে পারেনি। দূরবিনের নলের দু'মাথায় কাচ পরানো থাকে। একদিকের কাচ বেশ বড়ো। তা দিয়ে দূরবিনের নলের ভেতরে দেখবার জিনিসের ছবি তৈরি হয়। অন্য দিকের কাচ ছোটো। এতে সেই ছবিটিকে খুব বড়ো করে দেখায়। বড়ো দেখালেই মনে হয় জিনিসটাক কাছে দেখছি। বড়ো কাচখানির নাম অবজেক্ট গ্লাস। আর ছোটো কাচ যাতে চোখ রেখে তাকিয়ে দেখতে হয় তার নাম আই পিস।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় হ্যামিল্টন পাহাড়ের ওপর লিক মানমন্দিরে একটি বড়ো দূরবিন আছে। সেটা একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে। ঘরের উপরটা গম্বুজের মতো। তাতে গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত একদিকে ফাঁক আছে। ওই ফাঁকের মধ্যে দিয়ে আকাশ দেখতে হয়। দূরবিনের গায়ে ছোটো ছোটো অনেক দূরবিন আঁটা রয়েছে। একটা জিনিসকে বড়ো দূরবিন দিয়ে দেখতে হলে আগে ওই ছোটো দূরবিনে কোনা একটা দিয়ে খুঁজে বের করতে হয়।

—শ্যামল চক্রবর্তী

ভারতের পথে পথে

আনন্দপুর সাহিব

অতি পবিত্র শিখ তীর্থ পঞ্জাবের এই আনন্দপুর সাহিব। শিখদের পাঁচটি তখ্ত-এর অন্যতম এই আনন্দপুর। মহামুনি বশিষ্ঠ এখানে ধ্যান করেছেন। প্রবাদ, এখানেই বাল্মীকি মুনি রামায়ণ লিখেছেন। শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে চক নানকি-ই কালে কালে হয় আনন্দপুর সাহিব। নবম গুরু তেগ বাহাদুর ১৬৬৫-তে এখানে ডেরা গাড়েন। গুরু তেগ বাহাদুরের নানান স্মারক নিয়ে এখানে মিউজিয়ম হয়েছে। দিল্লিতে ঔরঙ্গজেবের হাতে তেগ বাহাদুরের শিরচ্ছেদ হলে তাঁর ছিন্ন শিরের দাহকার্য হয় আনন্দপুরেই। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ শুভ বৈশাখিতে এখানেই পাঁচজনকে দীক্ষা দিয়ে খালাসা করেন। তিনি ১ কিলোমিটার দূরে কেশরগড়ে দুর্গ গড়েন। হোলির সময় আনন্দপুরে জাকজমকপূর্ণ উৎসব হয়। হোলির পরদিন হোলা মহল্লায় নকল যুদ্ধানুষ্ঠান দেখতে বহু লোকের সমাগম হয়। আনন্দপুর ও তার আশেপাশে বহু গুরুদ্বারা রয়েছে।

জানো কি?

কোন স্থান কী নামে পরিচিত

- রাইসিনা হিলস— ভারতের রাষ্ট্রপতি বাসভবন।
- ৭ লোককল্যাণ মার্গ— ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন।
- হোয়াইট হাউস— আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন।
- পেন্টাগন— মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর।
- ক্রেমলিন— মস্কোর জার সম্রাটের প্রাসাদ।
- হোয়াইট হল— লন্ডনে ব্রিটিশ সরকারের সদর দপ্তর।
- বাকিংহাম— ইংল্যান্ডের রানির বাসভবন।

ভালো কথা

প্লাস্টিকের বদলে খাবার

এই অভিনব উদ্যোগটি নিয়েছে ভুবনেশ্বর পুর নিগম। মানুষ যাতে যেখানে সেখানে প্লাস্টিক না ফেলে সেজন্য সবাইকে সচেতন করতেই এই পরিকল্পনা। আধ কিলোগ্রাম প্লাস্টিকের পরিবর্তে দেওয়া হচ্ছে খাবার। ওড়িশা রাজ্য সরকারের আহার প্রকল্পের অধীনে ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ‘ মিল ফর প্লাস্টিক’ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভুবনেশ্বরে ওড়িশা রাজ্য সরকার পরিচালিত আহার সেন্টারে আধ কিলো প্লাস্টিক নিয়ে গেলেই মিলবে খাবার। পুর নিগমের অধিকর্তাদের কথায় ‘ মূলত প্লাস্টিক সংগ্রহ অভিযান চালাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মানুষকে খাদ্যেরও একটা নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস প্রোগ্রামের বর্জ্য প্লাস্টিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রকল্প প্রধান তারানা সৈয়দ বলেন, পরিবেশ বাঁচাতে এবং প্লাস্টিক বর্জ্য সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে এটা একটা ছোটো পদক্ষেপ। আহার সেন্টারের মাধ্যমে আমরা এখানকার যাবতীয় প্লাস্টিক সংগ্রহ করব এবং তার বদলে মানুষকে খাবার তুলে দেব। তারপর সেই সংগৃহীত প্লাস্টিক সঠিকভাবে পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা হবে।

রামকৃষ্ণ পাল, দ্বাদশ শ্রেণী, দিপালীনগর, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

মিষ্টি

সায়ণ টুডু, সপ্তম শ্রেণী, কেন্দপুকুর, মালদা।

শীতকালে সবই মিষ্টি
নতুন করে সাজে সৃষ্টি।
গুড় মিষ্টি রোদ মিষ্টি
ঠাণ্ডাটাও খুবই মিষ্টি।

বনভোজনে যাওয়া মিষ্টি
মুরগি লড়াই দেখাও মিষ্টি।
আরও আরও মিষ্টি পিঠেপুলি
সবচেয়ে মিষ্টি খেলা ডাংগুলি।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২১।।

দিদির পাশে নাই রে...

অনেক আগে থেকে ঘোষিত কর্মসূচি। ডাকা হয়েছিল দলের ছাত্র, যুবদের। আমার দুটোর একটারও বয়স নেই। ছাত্র আমি বটে তবে যুব নই একেবারেই। আরও অনেক প্রবীণদের সঙ্গে আমিও নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে গিয়ে বসেছিলাম। ছাত্র সেজে। আসলে ছাত্রদের তো কোনও বয়স নেই। আপনি এবার থেকে সব সমাবেশকেই ছাত্র সমাবেশ বলে ডাকবেন। তাতে আমাদের মতো বয়স্কদের একটু সুবিধা হয়। তাছাড়া দিদি, একটা কথা মানতেই হবে যে ছাত্রসমাজ আপনার সঙ্গে নেই। যুব সমাজও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এখন তাই বৃহত্তর ছাত্র সমাজই আপনার ভরসা।

অন্যান্যবার এই ধরনের সমাবেশে তিল ধারণের জায়গা থাকে না। কিন্তু ২৭ জানুয়ারি যেন উল্টো ছবি ছিল। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ছাত্র-যুব কর্মশালা দেখে অতীতের ছবির সঙ্গে কোনও মিল খুঁজেই পাওয়া গেল না। এমন ছবি দেখে সকাল থেকেই কপালে ভাঁজ ছিল নেতা-নেত্রীদের। আমারও। আর সেই ভিড়টুকুও রইল না আপনি দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সভা ছেড়ে বের হয়ে যাওয়ার পরে।

সমাবেশের শেষে এদিন সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত কর্মশালা চলার কথা। কিন্তু বেলা তিনটের সময়েই নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামের ছবি এমন হয়ে যায় যে বক্তব্য না রেখেই সভাস্থল ছেড়ে চলে যান যুব তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বক্তৃতা দেবেন বলে নাম ঘোষণাও হয়ে যায়। কিন্তু মাইকের সামনেই আসেননি অভিষেক। আসলে যখন তিনি বলতে উঠবেন তখন গ্যালারি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার হুড়োহুড়ি চলছে। আমার খুব কষ্ট হয়েছে এই ছবিটা দেখে। সত্যি বলছি দিদি। আপনিই তো বললেন, ছেলেটার মাথাতেও আজকাল প্রবলেম হচ্ছে। চোখের সমস্যা থেকে মাথার সমস্যা। তার উপরে এইসব চাপ অভিষেকের সহ্য হবে কেন!

নেতাজী ইনডোরে সেদিন আপনি যখন পৌঁছন তখনও খুবই করুণ অবস্থা সভাস্থলের। স্টেডিয়ামের ফ্লোরই ভরেনি, গ্যালারি খাঁ খাঁ করছে। এ দৃশ্য দেখে যে আপনি সন্তুষ্ট নন তা বোঝা গিয়েছে। আপনাকে তো আর আজ থেকে দেখছি না। মঞ্চে উঠেও বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলেন পিছনের সারিতে। তবে আপনি যখন বক্তৃতা দিতে ওঠেন তখন কিছুটা ভিড় বেড়েছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা শেষে বিধানসভার উদ্দেশে বেরিয়ে যেতেই সভাস্থল ফাঁকা হতে থাকে। এর পরে অভিষেকও বেরিয়ে গেলে স্টেডিয়াম আরও খালি হয়ে যায়।

সেদিন আপনি বক্তৃতার শেষ অংশে বারবার করে বলেন, আমি বেরোনোর পর আপনারা এই কর্মশালা চালিয়ে যাবেন। এখানে আমাদের ফেসবুক টিম আছে, আমি পরে সব দেখে নেব কে কী বক্তৃতা রাখছেন। তিনি বক্তৃতায় যা বলেছেন তার কতটা অংশ উপস্থিত ছাত্র-যুবরা নিতে পারল তার পরীক্ষা নিতেও বলেন সুব্রত বক্সিকে। কিন্তু কাদের পরীক্ষা নেবেন! বেশিরভাগ ছাত্র, যুবই তখন ঘরমুখী।

পরিস্থিতি যে এরকম হতে পারে তার আগাম আশঙ্কা আমার মধ্যেও ছিল। ছাত্র-যুবদের এই কর্মসূচিতে দলের অন্য নেতা-মন্ত্রীর উচিত ছিল লোক পাঠানোর। কিন্তু তাঁরা করেননি বা হতে পারে ইচ্ছাকৃত ভাবেই করতে চাননি। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে।

দিদি, এই ফাঁকা স্টেডিয়ামের বার্তা কিন্তু খুবই নেতিবাচক।

—**সুন্দর মৌলিক**

সামরিক শক্তির থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ভারতের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ

অতিথি কলম

স্বামীনাথন আইয়ার

এই সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা প্রশ্ন রাখতে পারি ভারতের ইতিহাসে কোন সময়টি ছিল সেরা উৎকর্ষের। এই সূত্রে ভারততত্ত্ববিদ Alexander Dalrymple একটি বিরল দৃষ্ট কিন্তু অত্যন্ত সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক গ্রন্থ 'The Anarchy' উদ্বোধনের সময় তিনি বলেছেন চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীই ছিল ভারতের স্বর্ণযুগ।

এই কালপর্বে ভারতের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ শান্তি, সুস্থিতির বাণী নিয়ে আফগানিস্তান থেকে চীন হয়ে জাপান এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াকে প্রভাবিত করেছিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিছু মন্দির ও স্মারকস্তম্ভ সেই সাংস্কৃতিক প্রভাবের ফলশ্রুতিতেই তখন নির্মিত হয়েছিল। আফগানিস্তানে বিশ্বখ্যাত বামিয়ান বুদ্ধের বিশালাকার মূর্তিগুলি, ইন্দোনেশিয়ায় প্রমবানন ও বরবদুরের মন্দির, কাম্বোডিয়ায় ওঙ্কারভাট কিংবা চীনের ডান হুয়াং শহরে বৌদ্ধ গুহাগুলি তারই কয়েকটি নিদর্শন।

এই প্রসঙ্গে ওড়িশার ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বহু নাবিক এখান থেকেই ইন্দোনেশিয়া যাত্রা করত। তারা সঙ্গে করে নিয়ে যেত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুষঙ্গগুলি। চতুর্থ শতাব্দীর আগমন লগ্নেই জাভা ও বালিতে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। শুনলে অবাক হবেন, ইন্দোনেশিয়ায় ওড়িয়া প্রভাবের প্রমাণ স্বরূপ ১৯টি জগন্নাথ মন্দির আজও বিদ্যমান।

অত্যন্ত শক্তিশালী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজত্বকাল শুরু হয়েছিল থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায়। উল্লেখ্য, ধর্ম দুটি প্রসার লাভ করেছিল শান্তির দূত বণিক ও পুরোহিতদের যুগ্ম অংশগ্রহণে। অবশ্যই পরবর্তীকালে অনেক হিন্দু রাজবংশ সামরিকভাবেও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। রামায়ণ-কাহিনি ভিত্তিক নাচ হতে পেরেছে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় নৃত্য, এমনকী পরবর্তী সময়ে দেশটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে যাওয়ার পরও এই প্রথার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জাকার্তার জাতীয় সংগ্রহশালা হিন্দু শিল্প নিদর্শনে ঠাসা; তুলনায় মুসলমান নিদর্শন হাতে গোনা।

থাইল্যান্ডের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন শহরের নাম অয়ুথ্যা। বুঝতে অসুবিধে হয় না এটি অযোধ্যারই অপভ্রংশ মাত্র। অয়ুথ্যা সাম্রাজ্যের শাসনকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মকে একই ধর্ম বলে মনে করা হতো। শুধু তাই নয়, থাই রাজারা ভগবান বোধিসত্ত্বকে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য করতেন। থাইল্যান্ডের জাতীয় মহাকাব্য 'রামাকিয়েন' আদতে রামায়ণ অনুসরণেই লিখিত বা পুরোপুরি গৃহীত। এখানকার বহু মন্দিরেই রামায়ণের ঘটনাবলী চিত্রিত আছে। এমনকী ব্যাঙ্ককের রাজপ্রাসাদেও রয়েছে রামায়ণের ছবির ছড়াছড়ি।

> সদ্য চলে যাওয়া এই সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা সেই স্বর্ণযুগকে স্মরণ করে এমন ভবিষ্যতের খোঁজে উদগ্রীব থাকব যেখানে ভারত আর সামরিক নয়, অর্থনৈতিকও নয়, বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের শপথ নেবে।

অন্যদিকে, বৌদ্ধধর্মকে চীনে নিয়ে যান একজন দক্ষিণ ভারতীয়, যাঁর নাম বোধিধর্ম। তাঁর জীবন সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রতিষ্ঠিত ও গ্রহণযোগ্য কাহিনিটি হলো তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের তামিল পল্লবী রাজবংশের রাজা সিংহবর্মার সন্তান। তিনি মল্লযুদ্ধ ও মার্শাল আর্ট প্রদর্শনে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন ও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁর মন গ্রামীণ রাজবংশ পরিচালনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ইচ্ছায় চীন যাত্রা করেছিলেন। কথিত আছে তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কঠিন কুংফুকে চীনের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শাওলিন মন্দিরে প্রচলন করিয়েছিলেন। আরও এক ভারতীয় গুরু পদ্মসম্ভব তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার করেছিলেন।

বণিক ও পুরোহিতেরা এই ভাবে প্রাচীন সিল্করুট ধরে ভারত থেকে চীনে, আরও এগিয়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারিত করেন। আমরা জানি, ভারতে অজন্তার বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন গুহাচিত্রগুলির কথা। বহু পর্যটকের দর্শনীয় সেগুলি। কিন্তু উল্লেখিত ডান হুয়াং প্রদেশে গোবি মরুভূমি মধ্যে অবস্থিত নিপুণভাবে অঙ্কিত 'মোগাও গুহায়' বুদ্ধ মূর্তির সংখ্যা ও আকারের কাছে অজন্তা ও ইলোরা নগণ্য ও ক্ষুদ্রকায়। এই গোবি মরুভূমি প্রাচীন বাণিজ্য ও ধর্মপথ ওই সিল্করুটের মধ্যেই পড়ে। এছাড়া সারা পথ জুড়েই আরও অজস্র গুহার মধ্যে হাজার হাজার বুদ্ধ মূর্তি শোভা পাচ্ছে।

যে সময়ের কথা যদি সেই সময়কার বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যা কোনও বিশেষ

সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠে থাকে তাহলে সেই সংস্কৃতির জন্মদাতা যে কোনও দেশ ছাদের উপর উঠে বুক বাজিয়ে তা প্রচার করত। হায়! আমাদের ভারত এই নিয়ে নীরব; মাঝে মধ্যে হয়তো কিছু কানাঘুসো উঠে আসে। আমাদের ইতিহাস বই, সাহিত্য, বলিউডের তুমুল সাফল্য পাওয়া চলচ্চিত্রগুলি কেবলমাত্র মরণপণ যুদ্ধ ও বিজয়ের সাফল্য বর্ণন ও প্রদর্শন করতেই যেন মশগুল হয়ে থাকে। তাঁরা অতীতের রাজা ও তাদের সেনাধ্যক্ষদের সাফল্য ঢক্কানিনাদের সঙ্গে তুলে ধরে, কিন্তু এই এক সময় পবিত্র সংস্কৃতির যে পুষ্প এশিয়া ব্যাপী বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার উন্মেষ যে এই ভারতেই হয়েছিল একথা প্রায় অনুক্তই থেকে যায়।

ভারতীয় জনতা পার্টি একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী দল। বলতে দ্বিধা নেই তারাও কিন্তু ভারতে উদ্ভূত এই মহান হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি কী শান্তিপূর্ণ পথে প্রাচীন বিশ্বের অর্ধেক জনসংখ্যাকে প্রভাবান্বিত করে এই সংস্কৃতির অনুরক্ত করে তুলেছিল সে কথা সঠিকভাবে তুলে ধরে না। বিজেপির বৌদ্ধিক চিন্তন অনুযায়ী বুদ্ধ ভগবান বিষ্ণুরই নবম অবতার। কিন্তু তাদের কশ্চিৎ কদাচিৎ এ নিয়ে সেই ধরনের কোনো গর্ব প্রকাশ করতে দেখা যায়। যার ফলে মায়াবতীর দল বিএসপি ভারতে বুদ্ধকে তাদের কুক্ষিগত করে ফেলেছে। বিজেপি অপরপক্ষে প্রাচীন যুদ্ধবিগ্রহগুলিতে হিন্দু রাজাদের সাফল্য ও বীরত্বকে প্রাধান্য দেয়। উঠে আসে বহু সমর নায়ক, চিহ্নিত হন নির্দিষ্ট খলনায়কেরা। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই সম্রাট হিমুর নাম উল্লেখিত হয়েছে বারবার। ১৫৫৬ সালে হিমু মোগল সেনাদের অবশ্যই হারিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দিল্লির সিংহাসন জয় দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যুদ্ধ করেও দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ তাঁকে হারতে হয়েছিল। তুলনায় ভারতের সাংস্কৃতিক জয়গুলির আয়ু ছিল অনেক দীর্ঘ।

এ প্রসঙ্গে বিজেপির ইতিহাসবিদরা মার্কসবাদী ইতিহাসকারদের বারংবার ইতিহাস বিকৃতি করার দায়ে অভিযুক্ত করেন। তা যথাযথ। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত

ভারতের তুলনামূলক দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক জনপদ ব্যাপী অর্জিত শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক বিজয়ের পঞ্জীকরণে কি তেমন প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে? সমগ্র এশিয়া জুড়ে এই গৌরবময় ভারতীয় সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এক অর্থে অবহেলিতই রয়েছে।

ইতিহাসে জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ ও সামরিক আগ্রাসনকেই বড়ো করে দেখার প্রবণতা আছে। কিন্তু সমর শক্তির বদলে সংস্কৃতির কোমল শক্তি (soft power)-র মাধ্যমে এক ফোঁটা রক্তপাত ছাড়াই ভারত যে তার সর্বকালীন বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিল তা উপেক্ষিতই রয়ে গেছে। দোষ দেওয়া যায় না কারণ এটি দৃষ্টিকোণেরই দীনতা। সমস্ত ইতিহাসবিদই আমাদের কেবলমাত্র সামরিক বিজয়কেই গৌরবান্বিত করে দেখতে শিখিয়েছেন।

সদ্য চলে যাওয়া এই সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা সেই স্বর্ণযুগকে স্মরণ করে এমন ভবিষ্যতের খোঁজে উদগ্রীব থাকব যেখানে ভারত আর সামরিক নয়, অর্থনৈতিকও নয়, বিশ্বব্যাপী সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের শপথ নেবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই
স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।
টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।
ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata-71**

রাজ্যে শিক্ষা পরিবেশের দফারফা

শুভ্র সান্যাল

কবিগুরু দেশের মানুষের ঘুম ভাঙাতে এবং ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে গান বেঁধেছিলেন— 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'! আর আজ রবীন্দ্রনাথের সেই কালজয়ী গানের প্রায় একশো বছর পর রাজ্যের নেত্রীর ডাকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উপাচার্যরা পড়াশুনার কাজ বন্ধ রেখে দৌড়চ্ছেন নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বেতন বৃদ্ধির কথা শুনতে। নেত্রীও টোপ ফেলছেন সমবেত অধ্যাপকদের, উপাচার্যদের উদ্দেশে। কোথায় উপাচার্য ত্রিগুণা সেন, উপাচার্য গোপাল সেন, উপাচার্য সত্যেন সেন, উপাচার্য অম্লান দত্ত'র গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার? রাজ্যের শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের মঞ্চে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সঙ্গে সংঘাত বেঁধেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সত্যেন সেনের। সত্যেন সেন পিছু হঠেননি। লক্ষণীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় ছিলেন অতি উচ্চমানের ব্যারিস্টার। সত্যেন সেনও ছিলেন অসাধারণ মেধাবী অধ্যাপক। পণ্ডিত ও জ্ঞানী-গুণীদের যুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা পেয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় সভা করতে পারেননি। আর এখন ডাক শুনলেই হলো! নেত্রী ডাক দিলেন আর সবাই ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দৌড়লেন! নেত্রী ছিপ ফেললেন আর সবাই টোপ খাওয়া শুরু করলেন। উপাচার্যদের পাশে বসিয়ে (উপাচার্যরা অবশ্য নেত্রীকে ঘিরে দাঁড়িয়েই থাকেন) নেত্রী চিৎকার শুরু করলেন— 'তাহলে এখন ঘোষণা করছি।' এই ঘোষণা করছি কথাটা তিনি আরও পাঁচবার বললেন। আর ওদিক থেকে সমস্বরে চিৎকার অধ্যাপক, আধা-অধ্যাপক, সিকি-অধ্যাপক, কিঞ্চিৎমাত্র-অধ্যাপক, কণামাত্র অধ্যাপক সকলের। নেত্রী বলছেন— 'তাহলে ঘোষণা করি।' কণামাত্র-অধ্যাপকরা সিটি মারা শুরু করলেন। নেত্রী বলছেন, 'ঘোষণাটা করেই দিই'। ঘোষণা হলো--- এখন থেকে অধ্যাপকদের চাকরির বয়স ৬২ হয়ে গেল। অধ্যাপকদের মুখ গম্ভীর। সিটিওয়ালাদের সিটি স্তব্ধ। আর নেত্রী বলছেন, 'কি খুশি তো, কি খুশি না? কিন্তু হাততালি নেই কেন?'

শিক্ষাক্ষেত্রে লুম্পেনদের দাপাদাপি। দিন দশেক আগে নেত্রী কৃষ্ণকলি বসু মালদায় কলেজ অধ্যাপকদের ডাকলেন। সবাই কলেজ ছেড়ে দৌড় লাগালেন। নেত্রী ভাষণ দিলেন— 'যারা দিনে টিএমসি আর রাতে বিজেপি তাদের মুখোশ টেনে ছিঁড়ে দেব।' অধ্যাপকদের সমাবেশে লুম্পেনের ভাষা!

আজ কলেজগুলো শাসন করছে গুন্ডা, লুম্পেন, চোর, দাগি আসামিরা। কলেজের ক্লাসরুমে দুষ্কৃতী সমাজবিরোধীরা নির্দ্বিধায় ঢুকে যাচ্ছে। দুষ্কৃতীদের ভয়ে কলেজে ছাত্রীরা যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী একবার খবর নিয়ে দেখুন কলেজ ছাত্রীদের বাবা-মায়েরা কলেজের গুন্ডাদের হাত থেকে মেয়েদের বাঁচাতে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ছাত্রীরা গুন্ডাদের এতটাই ভয়ের ও ঘৃণার চোখে দেখছে যে তারা দক্ষিণ ভারতে চলে যাচ্ছে নার্সিং কোর্স করতে। পশ্চিমবঙ্গের ডিগ্রি কলেজে ছাত্রীরা আর উচ্চশিক্ষার দরজায় পৌঁছতে পারছে না। কলেজগুলোতে ঘোরতর অন্ধকার নামিয়ে নিয়ে এনেছে সমাজবিরোধীরা। পড়াশুনা বিদায় নিয়েছে আর অধ্যাপকরা দৌড়চ্ছেন স্যালারি হাইকের কথা শুনতে। গুন্ডার আস্ফালন চলছে আর অধ্যাপকরা টাকা গুনছেন। অধ্যাপক অমল রায়চৌধুরী, অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসু, অধ্যাপক তারক মোহন সেন, অধ্যাপক তারক মোহন দাস, সুশোভন সরকারের মতো অধ্যাপকদের আজ পাওয়া যাবে না। ছাত্রনেতারা, শয়তানরা মেয়েদের লাঞ্ছনা করছে। কেউ ছাত্রীদের বাঁচানোর জন্য নেই। গুন্ডারা ঘুসের টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নিচ্ছে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে। আর এই ঘুসের টাকা দিয়েই দল চলছে। কালিয়াচক কলেজ, চাঁচল কলেজ, সামসী কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ সর্বত্রই গুন্ডাদের দাপাদাপিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কালিয়াচক কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশত বর্ষ অনুষ্ঠানে গুন্ডারা সভাকক্ষের আলো নিভিয়ে দেয়। গুন্ডারা চিৎকার করে প্রিন্সিপ্যালকে বলে ডিপিআই থেকে প্রাপ্ত টাকার হিসাব না দিলে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত বর্ষ অনুষ্ঠান করতে দেবে না। প্রিন্সিপ্যাল টিএমসিপি গুন্ডাদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশ যে, রাজ্যের শাসকদলের ছাত্রসংগঠন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কর্মীর সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ৩০-৪০ হাজার টাকা নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের থেকেও অনেক বেশি নম্বর পাইয়ে দিচ্ছে। আর রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক ছেলে ভুলানো গল্প শোনাচ্ছেন যে মার্কশিট অনলাইনে হয়। কতিপয় দালাল, শাসকদলের গুন্ডা বদমাইশদের মদতে পরীক্ষার নম্বরকে এদিক ওদিক করে দেওয়ার ঘটনাকে আড়াল করতে রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ামক সংবাদমাধ্যমে আষাঢ়ে গল্প ফাঁদছেন। আর উপাচার্য চুপ। এমনকী এই দালাল চক্রের বিরুদ্ধে লোক দেখানো তদন্ত কমিশন গঠনের কথাও উচ্চারিত হয়নি। ∎

রাজ্যের শাসকদলের ছাত্রসংগঠন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি কর্মীর সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে ৩০-৪০ হাজার টাকা নিয়ে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের থেকেও অনেক বেশি নম্বর পাইয়ে দিচ্ছে। আর রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ামক ছেলে ভুলানো গল্প শোনাচ্ছেন যে মার্কশিট অনলাইনে হয়।

বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার পর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ইসলামিকরণ

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থা ইসলামিকরণের পর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে কীভাবে মৌলবাদী চেতনার বিকাশ ঘটানো হয়েছে তার অন্যতম নজির হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনের দিন ধার্য করতে গিয়ে অন্য ধর্মকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, আঘাত করা তাদের নিয়মে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি সরস্বতী পুজো নিয়ে তুলকালাম কাণ্ডের পর নির্বাচন কমিশনের বোধোদয় হবে কিনা জানি না। তবে একটা বড়ো রকমের শিক্ষা দিয়েছে হিন্দু সমাজ বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা।

৩০ জানুয়ারি সরস্বতী পুজোর দিন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেছিল নির্বাচন কমিশন। হিন্দু সমাজের প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখেও নির্বাচন আয়োজনে অটল ছিল কমিশন। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে পুজোর থেকেই প্রতিবাদ জানানো হচ্ছিল। দাবি জানানো হয় ভোটের তারিখ পরিবর্তনের। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে ভোটের তারিখ পেছানোর দাবি জানান। কিন্তু নির্বাচন কমিশন সচিব যুক্তি দেখান, ৩১ তারিখ শুক্রবার জুম্মাবার। ওইদিন ভোট হতে পারে না। অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর দিন, তাও আবার বছরে এই একটা দিনের সরস্বতী পুজো হয়, সেদিন ভোট হতে পারে। সাপ্তাহিক জুম্মাবারে ভোট হতে পারে না। এর পরের দিন ১ ফেব্রুয়ারি মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু। তাই ওইদিনও ভোট হতে পারে না।

ঐক্য পরিষদের সঙ্গে আলোচনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, প্রয়োজনে পুজো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দোতলায় কোনো কক্ষে বা মিলনায়তনে

আয়োজন সংক্ষিপ্ত করার জন্যে বলা হয়েছিল। হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হয়। কিন্তু আদালতও নির্বাচন কমিশনের পক্ষে রায় দেয়। এর পরই প্রথমে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধে নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু শিক্ষার্থীরা। শেষ পর্যন্ত তারা আমরণ অনশনে যেতে বাধ্য হয়। টানা তিনদিনের অনশনে প্রায় ২০ জন শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে, মুমূর্ষু অবস্থায় কয়েকজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এর মধ্যে রাজধানীর বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে হিন্দু শিক্ষার্থীদের মধ্যে। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ কয়েক ধাপে প্রতিবাদের কর্মসূচি ঘোষণা করে। শামিল হয় অন্য হিন্দু সংগঠনগুলোও। ভোট বর্জনের মতো কর্মসূচি নেওয়ার তাগিদ আসে। শেষ পর্যন্ত দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পরিস্থিতিতে নির্বাচন পিছিয়ে দিতে হয় নির্বাচন কমিশনকে। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রীকেই অচলাবস্থা অবসানে এগিয়ে আসতে হয়।

বগুড়ায় গত অক্টোবর মাসে জাতীয় সংসদের এক শূন্য আসনে উপনির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল দুর্গা পুজোর সপ্তমীর দিন। প্রতিবাদ সত্ত্বেও কমিশন অবস্থান থেকে সরেনি। শেষ পর্যন্ত ঐক্য পরিষদ ও অন্য হিন্দু সংগঠনগুলো ভোট বর্জনের ডাক দেয়। তা সত্ত্বেও ভোট সম্পন্ন করে কমিশন। আর তাতেই সাহস বেড়ে গিয়েছিল নির্বাচন কমিশনের। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে এবারে সরস্বতী পুজোর দিন ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের দিন ধার্য করেছিল কমিশন। রাজধানীতে মূলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভোটকেন্দ্র স্থাপিত হয়। আর বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিন্দু শিক্ষার্থীরা সরস্বতী পুজোর আয়োজন করে। এ কারণেই সিটি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর স্থানান্তরিত করা যেতে পারে। সচিব বলেন, ভোটকেন্দ্রে পুজোর আয়োজন করা যাবে। পুজোর জায়গা বাদ দিয়ে ভোটকেন্দ্র করা হবে। নির্বাচন কমিশনে এই বক্তব্যের জবাবে ঐক্য পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়, নির্বাচন কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠের পুজোকে একটি কক্ষে বন্দি করতে চাইছে। নির্বাচন চলাকালে ভোট কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি থাকে। মোতায়েন থাকে নিরাপত্তা বাহিনী। স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে সেনাবাহিনীও প্রস্তুত থাকে। এর মধ্যে পুজো হবে?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) হিন্দু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে। সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন পিছানোর দাবি জানায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে এসে সহানুভূতি জানান। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও সমর্থন জানায় শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে। বিএনপিও সরস্বতী পুজোর দিন নির্বাচন দেওয়ার কড়া সমালোচনা করে। অনশনরত হিন্দু শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগ দেয় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরাও। আওয়ামি লিগের এক হিন্দু সাংসদ পঙ্কজ দেবনাথ জাতীয় সংসদে অধিকার প্রস্তাবে দাঁড়িয়ে বলেন, পুজোর দিনে হিন্দুরা পুজোয় ব্যস্ত থাকে। তাদের ভোটদান থেকে বিরত রাখার জন্যেই পুজোর দিন নির্বাচন দেওয়া হয়েছে। এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র আছে।

শেষ পর্যন্ত নির্বাচন পিছিয়ে দিতে বাধ্য হয় নির্বাচন কমিশন। তাও প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে। এবারের আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এগোতে পারলে মঙ্গল। তাদের নানা কার্যক্রম বিশেষ করে নির্বাচন আয়োজনে এই সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থা ইতিমধ্যে তলানিতে পৌঁছেছে। ■

হাওড়ার তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে স্বামীজী জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন

হাওড়া জেলার তাজপুরে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচারের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। প্রসাদ স্মৃতি সরস্বতী শিশুমন্দিরের ছাত্র-ছাত্রী, আচার্য-আচার্যা-সহ এলাকার মানুষের সম্মিলিত শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমা করে প্রসাদ তীর্থের সভাগৃহে মিলিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ, ড. শ্যামাপ্রসাদ ও পল্লীপ্রাণ সমাজসেবী প্রসাদ চক্রবর্তীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যার্পণ করা হয়। পরে স্বামীজীর জীবন ও কর্মের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নন্দলাল মণ্ডল, তপন রীত, লায়নস ক্লাব অব কলকাতা আর্টস অ্যান্ড কালচারালের সভাপতি অমরেশ কুমার রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শেষে সভাকক্ষে আগত এলাকার শতাধিক দুঃস্থ ও বয়স্ক মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করেন লায়নস ক্লাবের কর্মকর্তারা।

বিকেলে শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় আমতা-জয়পুর থানা স্পোর্টস্ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় 'প্রসাদ স্মৃতি ফুটবল প্রতিযোগিতা'র ৩১তম বর্ষের চূড়ান্ত খেলা তাজপুর অ্যাথলেটিক ফুটবল মাঠে খালনা পারিজাত ফুটবল ক্লাব ও সোমেশ্বর-সন্তোষনগর মৈত্রী সঙ্ঘের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় খালনা-পারিজাত ১-০ গোলে সোমেশ্বর-সন্তোষনগরকে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। প্রতিযোগিতায় আমতা ও জয়পুর থানার ২৮টি ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিক পর্বের খেলাগুলি দুই থানার বিভিন্ন মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। কেবল দুটি অর্ধ চূড়ান্ত ও চূড়ান্ত খেলা তাজপুর মাঠে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে প্রসাদবাবুর স্মৃতিচারণ ও পুরস্কার প্রদান করেন প্রাক্তন জাতীয় খেলোয়াড় তথা বর্তমান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ফুটবল প্রশিক্ষক আলভিটো-ডি-কুনহা, এলাকার বিধায়ক অসিত মিত্র, হাওড়ার বিশিষ্ট সমাজসেবী অসিত চ্যাটার্জি, আমতা-২ পঞ্চায়ত সমিতির সভাপতি সুকান্ত পাল, তাজপুর গ্রামপঞ্চায়ত প্রধান গোলাম খাঁ, বিশিষ্ট প্রসাদ অনুরাগী হাসেম খাঁ, আমতা-জয়পুর থানা স্পোর্টস্ অ্যাসাসিয়েশনের কর্মকর্তারা-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। এলাকার প্রতিটি ক্লাবের পাঁচজন সদস্য মাঠের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিশির ভট্টাচার্য।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির

পশ্চিমবঙ্গের প্রখ্যাত সমাজসেবী সংস্থা বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির উদ্যোগে গত ৩ জুন হাওড়া জেলার আমতার রামচন্দ্রপুর গ্রামে স্বাস্থ্য ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ১০৫ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৮৬ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয় এবং ৪৪ জনের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা, ৯০ জনের বিএমডি ও ১১ জনের ইসিজি করা হয়। গত ১ জুলাই উত্তর কলকাতার দমদম মিত্রবাগানের সংগীত মঞ্জরীর উদ্যোগে ৬৪ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ৫৪ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয় এবং ৬২ জনের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা, ৭১ জনের বিএমডি ও ৫ জনের ইসিজি করা হয়। গত ১৫ আগস্ট হুগলী জেলার ভূড়া গ্রামে বিভূতিভূষণ সরকার সেবা পরিষদের পরিচালনায় ১২৭ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১০১ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয় এবং ৬৭ জনের বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। গত ১৬ জানুয়ারি উত্তর কলকাতার কাশীপুর প্রুডেন্সিয়াল ইয়ুথ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় কাশীপুর রোডে ২০৩ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১৭৩ জনকে বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

গত ১৪ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিঙে ভারতমাতা পূজা উদ্‌যাপন কমিটি ও স্বদেশি জাগরণ মঞ্চে পরিচালনায় ১৬০ জনের চক্ষু পরীক্ষা করে ১৪৪ জনকে বিনা মূল্যে চশমা দেওয়া হয়।

সমস্ত স্থানেই বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বিগত 'বুলবুল' ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৭৩ টি বাড়ি পুনর্নির্মাণের জন্য ৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সহায়তা হিসেবে প্রদান করে। এছাড়া ৭০০ জনকে কম্বল প্রদান করে। এই সেবাকাজের জন্য শ্যাম স্টিল কতৃপক্ষ আর্থিক সহায়তা করে।

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার দুর্গাপুর গ্রামীণ নৃত্য সংগীত প্রতিযোগিতা

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পক্ষ থেকে গত ২১ ও ২২ জানুয়ারি দুর্গাপুর টাউনশিপে 'শিল্পাঙ্গণ' প্রেক্ষাগৃহে 'দুর্গাপুর গ্রামীণ নৃত্য সংগীত প্রতিযোগিতা-২০২০-'র আয়োজন করা হয়। কারখানার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতিযোগিতায় কারখানা সংলগ্ন গ্রামগুলি থেকে ৫৫৭ জনকে নিয়ে গঠিত ৪০টি দল অংশ নেয়। গত ২২ তারিখ ওই প্রেক্ষাগৃহে প্রতিযোগিতায় জয়ীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক এ ভি কমলকার-সহ কারখানার উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে গত ২১ তারিখ শ্রীকমলকার প্রদীপ প্রজ্বলন করে প্রতিযোগিতার সূচনা করে বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতির গভীরতা ও সমৃদ্ধতা সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের জীবনকেই প্রভাবিত করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার পক্ষ থেকে বিগত কয়েক বছর ধরে সংলগ্ন গ্রামগুলির সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও মেধাবী শিল্পীদের পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে গ্রামীণ নৃত্য সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে আসছে।

জনসমাজ কল্যাণ সঙ্ঘের পার্কের পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যা বিষয়ে আলোচনা সভা

সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী একটি সেমিনার দেখলো উত্তর কলকাতা। গত ১৮ জানুয়ারি মোহিত মৈত্র মঞ্চের আলোচনা সভায় উঠে এল কলকাতার বিভিন্ন পার্কের পরিবেশ ও নিরাপত্তাজনিত সমস্যাগুলি। কোথাও আলোর অভাব, কোথাও সুইমিং পুলের অপরিষ্কার জল, কোথাও খেলার মাঠের অব্যবস্থা, আবার কোথাও খারাপ হয়ে যাওয়া ফোয়ারার জলে মশার প্রাদুর্ভাব— এরকম বেশ কিছু উদাহরণ। উপস্থিত ছিলেন ধর্মরূপানন্দ মহারাজ, মহামণ্ডলেশ্বর পরমাত্মানন্দজী মহারাজ, প্রভুজী, সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপক ভট্টাচার্য, সাহিত্যিক প্রহরী, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি পার্থসারথি মুখার্জি-সহ বহু স্বনামধন্য চিকিৎসক, বাস্তুকার, আইনজীবী। উদ্যোক্তাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কিংশুক সেনগুপ্ত ও শুভেন্দু ভট্টাচার্য। আলোচনা সভায় বিশেষভাবে উঠে আসে পার্কের সবুজ ধ্বংস করে কংক্রিটের ব্যবহার এবং পার্কের ভিতরে অবাধে গাড়ির প্রবেশ। টালা ঝিল পার্কের ভিতর গাড়ির ধাক্কায় নিহত আরতি সেনগুপ্তকে পার্ক নিরাপত্তার প্রথম শহিদ বলে উল্লেখ করেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল দীপক ভট্টাচার্য। তিনি টালা ঝিল পার্কের নাম 'আরতি সেনগুপ্ত উদ্যান' রাখার প্রস্তাব করেন। আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথি এবং শ্রোতারা সোচ্চারে প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগৃহীত হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ও পুরমন্ত্রী তথা মেয়রের কাছে গণস্বাক্ষর-সহ এই দাবি পেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় প্রত্যেকে এই আন্দোলনকে আগামীদিনে আরও শক্তিশালী করার শপথ গ্রহণ করেন। সভা পরিচালনা করেন অভিনেত্রী গার্গী চক্রবর্তী। ■

বাঁকুড়ার মুড়লু গ্রামে সরস্বতী মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া ব্লকের মুড়লু গ্রামে গত ১লা মাঘ ঐতিহ্যমণ্ডিত সরস্বতী মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। সেদিন সকালে বিশাল শোভাযাত্রায় সংকীর্তন সহকারে ১০৮ জন কুমারী কন্যার দ্বারা আনীত মঙ্গলঘটের জলে মন্দিরের অভিষেক হয়। দুপুরে নরনারায়ণ সেবায় ৮ হাজার মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিভাগ প্রচারক কেদার মাল। মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সাতদিন ধরে গ্রামে স্বচ্ছতা অভিযান চালানো হয়। গ্রামের ১০০ জন মেয়ে ও গৃহবধূ গ্রামের রাস্তায় আলপনা দিয়ে সজ্জিত করেন।

নদীয়ার কৃষ্ণনগরে পিআইবি কলকাতার মিডিয়া কর্মশিবির ‘বার্তালাপ’

কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তাপুষ্ট বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য জনসাধারণের কাছে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জেলার ছোটো ও মাঝারি সংবাদপত্রগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গত ২২ জানুয়ারি প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো কলকাতার উদ্যোগে গণমাধ্যম শীর্ষক কর্মশিবির ‘বার্তালাপ’-এর আয়োজন করা হয়।

পিআইবি কলকাতার অতিরিক্ত মহানির্দেশক শ্রীমতী জেন নামচু কর্মশিবিরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য প্রদানকারী পিআইবির কাজকর্ম সম্পর্কে নদীয় জেলায় কর্মরত সংবাদ প্রতিনিধিদের বিস্তারিত জানান। কর্মশিবিরে অংশগ্রহণকারী সংবাদ প্রতিনিধিরা দৈনন্দিন কাজকর্মের ক্ষত্রে যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন তার উল্লেখ করেন। প্রবীণ সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী মানুষের কল্যাণে রূপায়িত সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিআইবি-র সংবাদ, প্রবন্ধ ও আলোকচিত্রের ব্যাপারে সাংবাদিকদের জানান। কেন্দ্রীয় সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলির সুযোগসুবিধা কীভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে পিআইবি-র তথ্য কাজে লাগানোর জন্য তিনি সংবাদ প্রতিনিদিদের অনুরোধ জানান। কর্মশিবিরে সাংবাদিকদের জানানো হয় যে, পিআইবি-র সংবাদ, আলোকচিত্র, ইনফোগ্রাফিক্স ও অন্যান্য মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইট, ফেসবুক ও ট্যুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলা ছাড়াও হিন্দি ও ইংরেজি-সহ অন্যান্য ভারাতীয় ভাষাতেও পাওয়া যায়।

জেলার অগ্রণী ব্যাঙ্ক ইউবিআই-এর আধিকারিক বিমল কুমার ভট্টাচার্য কন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক কর্মসূচি যেমন, প্রধানমন্ত্রী জনধন যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী শস্য বিমা যোজনা ইত্যাদি সম্পর্কে সংবাদ প্রতিনিধিদের অবহিত করেন। শিবিরে ৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করে মতবিনিময়ে অংশ নেন। কৃষ্ণনগর পরিবেশ বন্ধু সংগঠনের সচিব মহম্মদ ইনাসুদ্দিন কৃষ্ণনগর-সহ নদীয়া জেলায় পরিবেশের সুরক্ষা-সহ প্লাস্টিক মুক্ত করার লক্ষ্যে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে বিশদ জানান। তিনি বলেন, জেলায় প্লাস্টিক নির্মিত ক্যারিব্যাগ ও থার্মোকলের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। প্লাস্টিকের মতো ক্ষতিকারক সামগ্রীর ব্যবহার বন্ধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সংবাদমাধ্যমের এগিয়ে আসার প্রচেষ্টার তিনি প্রশংসা করেন। জেলায় নাবার্ডের ডেপুটি ম্যানেজার ড. অমৃত চট্টোপাধ্যায় স্বনির্ভব গোষ্ঠীগুলিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ সহায়তার কথা জানান।

এছাড়াও, কৃষি বিপণন পরিকাঠামো কর্মসূচি, ফসল বিমা যোজনা, শস্য ঋণ, ডেয়ারি পরিকাঠামো উন্নয়ন তহবিল প্রভৃতি খাতে সহায়তায় গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলেও জানান। শিবিরে পিআইবি কলকাতার মিডিয়া ও কমিউনিকেশন অফিসার শ্রীমতী শ্রীজাতা সাহা সাহু ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন। ■